চারু ও কারুকলা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

চারু ও কারুকলা

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

মুস্তাফা মনোয়ার
হাশেম খান
এভলিন মালাকার
এ.এস.এম আতিকুল ইসলাম
সনজীব দাস

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

চারু ও কারুকলা শিক্ষা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রকৃতি, পরিবেশ, জীবন ও জীবনধারা ইত্যাদি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। চারু ও কারুকলা শিক্ষা অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণে যেমন, সাধারণ বিজ্ঞান, ভূগোল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা ইত্যাদি বিষয়ের প্রয়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। এ শিল্পশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, পরিমিতিবোধ, সৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটে এবং তারা হয়ে ওঠে সৃজনশীল।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার ইতিহাস	১–৭
দ্বিতীয়	চিত্রকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা	৮–১৬
তৃতীয়	বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প	১৭–২৬
চতুর্থ	ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম	২৭–৩০
পঞ্চম	ছবি আঁকার নানারকম আনন্দদায়ক অনুশীলন	৩১–৩৯
ষষ্ঠ	বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম	৪০–৬০
	রঙ ও রঙের ব্যবহার	৬১–৬৮

প্রথম অধ্যায়

বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার ইতিহাস

চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- বাংলাদেশে চারু ও কারুকলা শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব।
- বাংলাদেশে চারুকলা শিক্ষার পথিকৃৎ শিল্পীদের নাম উল্লেখ করতে পারব।
- সমাজে শিল্প শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ছবি আঁকছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা চিত্রশিল্পী, গানের শিল্পীদের বলা হয় সংগীতশিল্পী, অভিনেতা অভিনেত্রীরা পরিচিত হন নাট্যশিল্পী বা চলচ্চিত্রশিল্পী হিসেবে। যারা নৃত্য পরিবেশন করেন তাঁরা নৃত্যশিল্পী হিসেবে পরিচিত। এভাবে সংস্কৃতি চর্চার প্রত্যেকটি বিভাগ ও বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন বা নির্দিষ্ট পরিচয় রয়েছে।

শিল্প ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই চর্চা বা অনুশীলন প্রয়োজন। ছোটোবেলা, বড়বেলা, যেকোনো বয়স থেকেই যেকোনো শিল্পকলার চর্চা করা যায়। আবার প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে চর্চা করার জন্য , নির্দিষ্ট কিছু সহজ নিয়ম-কানুন মেনে অনুশীলন করতে হয়।

যেমন গান গাওয়ার জন্য সুর, তাল, লয় ইত্যাদি ভালো করে বুঝে নিতে হয়। সারেগামা বা সপ্তসুর থেকে শুরু করে অন্যান্য সুর, তাল ইত্যাদি রপ্ত করার জন্য প্রতিদিন অভ্যাস করতে হয়। যাকে সংগীত শিল্পীরা বলেন রেওয়াজ করা বা গলা সাধা। একজন সংগীত শিল্পীকে সারাজীবনই রেওয়াজ করতে হয়। সংগীতের ক্ষেত্রে যাঁরা খ্যাতিমান তাঁরা জীবনভর এই নিয়ম মেনে রেওয়াজ করার বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

চিত্রকলার ক্ষেত্রেও নিয়মিত ছবি আঁকতে হয়। চর্চা বা অনুশীলন করতে হয়। তবে সংগীতের ক্ষেত্রে যেমন শিশু বয়স থেকে সারেগামা ও সুর তাল লয় শিক্ষা নিতে হয় – আঁকার ক্ষেত্রে শিশুদের ছবি আঁকার সাধারণ নিয়ম-কানুন জেনে ছবি আঁকার চেয়ে শিশু ইচ্ছেমতো আঁকুক, নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও ইচ্ছাকে রং তুলিতে তার কাগজে সহজে এঁকে ফেলুক – এই স্বাভাবিকতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুকে কখনো নির্দেশ দিয়ে ছবি আঁকানো উচিত নয়। শিশু ও ছোটরা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত নিজে নিজেই আঁকবে। শিশু নিজে আঁকতে পারছে বলে অপার আনন্দে খুবই সুন্দর ছবি আঁকে।

সাধারণত ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই ধীরে ধীরে আঁকার নিয়ম-কানুন জেনে ছবি আঁকার চেষ্টা করা ভালো, মোটামুটি পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিশু নিজে নিজে আঁকবে। নিয়ম-কানুন মেনে শিক্ষাগ্রহণ করাকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলে। বাংলাদেশে চারু ও কারুকলার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কথা এবার আমরা জানব।

কাজ : কোন বিষয়ে তোমার ছবি আঁকতে ভালো লাগে, সে বিষয়ে ৫টি বাক্য লেখো।

পাঠ : ২

স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগেই ঢাকায় ১৯৪৮ সালে চিত্রকলা শেখার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। উদ্যোগ গ্রহণ করেন কয়েকজন চিত্রশিল্পী। যাঁরা কলকাতা আর্ট কলেজে শিল্পশিক্ষা সমাপন করেন। তাঁরা হলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক ও শফিকুল আমিন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে প্রায় দুইশত বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। একটির নাম ভারত ও অন্য অংশের নাম পাকিস্তান। পাকিস্তানের আবার দুটি অংশ পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান।

২০২৪

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

১৯৪৮ সালে পূর্ব–পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাতে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় শিল্পীদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সামাজিকভাবে সেই কালে 'ছবি আঁকা' বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। কেউ ছবি এঁকে জীবনযাপন করবে এটা কেউ ভাবতেই পারত না। কারণ–ছবি এঁকে কী হবে? ছবি এঁকে উপার্জন করার তেমন ব্যবস্থা দেশে ছিল না, সরকারি কোনো চাকরিও ছিল না। তাহলে ছবি এঁকে কী হবে? অন্যদিকে সামাজিক কুসংস্কার ও গোঁড়ামিও একটি বড়ো বাধা ছিল।

শিল্পী কামরুল হাসান

তাই শিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, সফিউদ্দিন আহমেদ যখন সরকারকে প্রস্তাব দিলেন – দেশ ভাগাভাগির পর অন্য অনেক বিষয়ের মতো কলকাতা আর্ট কলেজের অর্ধেক পূর্ববাংলার মানুষ পায়। তাই সহজেই পূর্ববাংলার মানুষের জন্য রাজধানী ঢাকায় একটি আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। উল্লেখিত শিল্পীরা প্রায় সবাই ছিলেন কলকাতা আর্ট কলেজের শিক্ষক ও পূর্বতন ব্রিটিশ শাসিত ভারত সরকারের কর্মচারি।

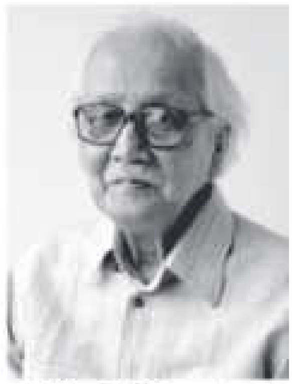

শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ

পাঠ : ৩

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার খুবই অবহেলায় শিল্পীদের প্রস্তাব বাতিল করে দিল। শিল্পীরা পিছ পা হলেন না। সরকারকে বোঝালেন – নতুন দেশকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে, মানুষের জীবন–যাপনকে সুন্দর ও রুচিশীল করার জন্য সমাজে শিল্পীদের প্রয়োজন আছে। কয়েকটি উদাহরণ তাঁরা সে সময় উল্লেখ করেন। যেমন–

১. সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে হবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন রোগ থেকে নিরাময় পেতে হলে – ছবি এঁকে পোস্টার তৈরি করে খুব সহজেই বোঝানো যায়। যা বইপুস্তকে লেখালেখি করে বোঝানো সহজ নয়। কারণ দেশে লেখাপড়া জানা মানুষের সংখ্যা খুব কম।

২. সরকারের বিভিন্ন বিষয়ের প্রচার কাজে– রাস্তায় হাঁটাচলা, বাস-ট্রাক চলাচলের নিয়ম–কানুন ইত্যাদির জন্য পোস্টার ও প্রচারপত্রের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন হবে।

৩. সহজে চাষ করা, সেচ দেওয়া, পোকামাকড় থেকে সাবধান থাকা থেকে শুরু করে কীভাবে কৃষি ফলন বাড়ানো যায় তা ছবি এঁকে সাধারণ কৃষককে বোঝানো যায়।

৪. মানচিত্র আঁকা, স্কুল-কলেজের পুস্তকের জন্য ছবি আঁকা, চিকিৎসাবিদ্যা ও কারিগরিবিদ্যার বই পুস্তকের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন জরুরি।

৫. সদ্য নতুন দেশে শিল্প কারখানা ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। এসব কারখানার উৎপাদনের পর বাজারে ও বিদেশে রপ্তানি করতে গেলে নানারকম রঙের মোড়ক তৈরি করতে হবে। নকশা ও ছবি আঁকতে হবে। ছবি এঁকে বিজ্ঞাপন করতে হবে।

সুতরাং দেশের কাজে, জনগণের প্রয়োজনে ও কল্যাণে সমাজে চিত্রশিল্পীদের প্রয়োজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই শিল্পী তৈরি করার জন্য একটি কলেজ বা প্রতিষ্ঠান যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরকারিভাবেই শুরু করতে হবে।

পাঠ : ৪

চিত্রশিল্পীরা এমনি নানারকম যুক্তি নিয়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে তুলে ধরলেন যে চারুকলা শিক্ষা দেশের প্রয়োজনেই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। শিল্পীদের এই উদ্যোগকে প্রশংসা করে এগিয়ে আসেন কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী বাঙালি। বিজ্ঞানী ড. কুদরত–এ–খুদা তখন পূর্ব–পাকিস্তান সরকারের জনশিক্ষা বিভাগের প্রধান (ডি পি আই)। তিনিও সরকারকে বোঝালেন চারুকলা শিক্ষা অবশ্যই প্রয়োজন। সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সলিমুল্লাহ ফাহমি, আবুল কাশেম প্রমুখ শিল্পীদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরা নানাভাবে সরকারের চারুকলা শিক্ষার প্রতি অনীহা ও বিরূপ মনোভাবকে সরিয়ে বিষয়টির প্রয়োজনকে উপলব্ধি করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। সেই সময়ে লেখক, সাংবাদিক ও সংস্কৃতির মানুষরাও ছবি আঁকা শিক্ষার গুরুত্ব বিষয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি শুরু করলেন। তাঁরা হলেন – ড. সারোয়ার মোরশেদ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুনীর চৌধুরী, শওকত ওসমান, অজিত গুহ, সিকানদার আবু জাফর, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ। লেখালেখি ও আলোচনার ফলে সরকারও ধীরে ধীরে নমনীয় হলেন। চারুকলা প্রতিষ্ঠান শুরু হবার ৪/৫ বছরের মধ্যেই চিত্রশিল্পীরা প্রমাণ করে চললেন যে কাজ মানুষকে আনন্দ দেয় ও মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয় সে কাজ কখনো খারাপ কিছু হতে পারে না। চিত্রকলা শিক্ষা ও চর্চা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

কাজ : ছবি আঁকা কল্যাণকর কেন?

পাঠ : ৫

অনেক চেষ্টার পর অবশেষে ছবি আঁকা শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যাপীঠ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী এই ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত হলো। তারিখ ছিল ১৫ নভেম্বর ১৯৪৮ সাল। নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের দুটি কামরায় শুরু হলো প্রথম ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠান। নাম দেওয়া হলো গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট। ১২ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল প্রথম বছর। অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান শিল্পী জয়নুল আবেদিন। অন্য শিক্ষকরা হলেন আনোয়ারুল হক, খাজা শফিক আহমেদ, কামরুল হাসান, সৈয়দ আলী আহসান ও শফিকুল আমিন। এঁরা প্রত্যেকেই কলকাতা আর্ট কলেজে পড়েছেন। জয়নুল আবেদিন, আনোয়ারুল হক ও সফিউদ্দিন আহমেদ কলকাতা আর্ট কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগও পেয়েছিলেন। ১৯৪৭–এ দেশ ভাগ হয়ে গেলে তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন। তারপর প্রায় এক বছর সংগ্রাম করে ঢাকায় কলকাতার অনুরূপ একটি চিত্রকলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। দুই বছর পর শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেন শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। তিনিও কলকাতা আর্ট কলেজে লেখাপড়া করেছেন।

কাজ : প্রথম ছবি আঁকার প্রতিষ্ঠানের নাম ও অধ্যক্ষের নাম কী?

পাঠ : ৬

চারু ও কারুকলার পথিকৃৎ শিল্পীরা

১৯৪৮ সালে শুরু হয় বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব–পাকিস্তানে শিল্পশিক্ষার সূচনা। যাঁরা এ আন্দোলন অর্থাৎ শিল্পশিক্ষার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদেরকেই আমরা বলব পথিকৃৎ শিল্পী। কারণ তাঁরা পথ দেখিয়েছিলেন বলেই আজ আমরা ছবি আঁকা শিখছি। এ বিষয়ে পড়াশুনা করছি। এ প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে পরবর্তীকালে দেশের শিল্পশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন বেশকিছু শিল্পী। প্রথম ব্যাচের ১২জন শিল্পীর মধ্যে পরবর্তীকালে দুজন খ্যাতিমান শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। একজন শিল্পী আমিনুল ইসলাম এবং দ্বিতীয়জন শিল্পী সৈয়দ শফিকুল হোসেন। অন্য দশজনের বেশিরভাগই চিত্রশিল্পী হিসেবে বা চিত্রকলাকে পেশা হিসেবেই গ্রহণ করে সমাজে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। আমিনুল ইসলাম বাংলাদেশের শিল্পকলা চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। বাংলাদেশের দীর্ঘ সময়ের শিল্পকলার ধারাবাহিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর বিশাল অবদান রয়েছে। আমিনুল ইসলাম ও সৈয়দ শফিকুল হোসেন চারুকলা ইনস্টিটিউটে অধ্যক্ষ হিসেবেও দীর্ঘদিন নিয়োজিত ছিলেন।

পাঠ : ৭ ও ৮

চারুকলা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেই শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও অন্য প্রতিষ্ঠাতা শিল্পীরা ক্ষান্ত থাকেন নি। শিল্পীরা যাতে সমাজের প্রয়োজনে নানাভাবে ছবি আঁকাকে কাজে লাগাতে পারে সে দিকেও তাঁরা নজর দিয়েছিলেন। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিল্পীদের জন্য সম্মানজনক পদ তৈরি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিত্রশিল্পের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে জনমত তৈরির জন্য শিক্ষক ও ছাত্ররা যৌথভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। এই চেষ্টা ছিল একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন। কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। অন্তত দশ থেকে বারো বছর লেগেছে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বোঝাতে যে, একটা সুন্দর সমাজ ও সুন্দর রাষ্ট্র তৈরিতে চিত্রশিল্প অন্যান্য পেশার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন– প্রকৌশলী, ডাক্তার, শিক্ষক, প্রশাসক, স্থপতি, অভিনেতা, সংগীতশিল্পী উন্নত সমাজের জন্য প্রয়োজন, তেমনি চিত্রশিল্পীরাও সুন্দর সমাজ গঠনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারছে।

তাই খুব সহজেই বলা যায়, বাংলাদেশের শিল্পকলাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিল্পী জয়নুল আবেদিন এক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে সমানভাবেই সংগ্রাম করেছেন শিল্পী আনোয়ারুল হক, শিল্পী সফিউদ্দিন আহমেদ, পটুয়া কামরুল হাসান, খাজা শফিক আহমেদ, শফিকুল আমিন ও শিল্পী মোহাম্মদ কিবরিয়া। প্রথম ১২ বছরের শিল্পশিক্ষায় যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও সমান নিষ্ঠা নিয়ে তাঁদের গুরুদের সঙ্গে কাজ করেছেন। ফলে বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পচেতনার একটি বৈশিষ্ট্য ও রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা বাংলাদেশের শিল্পকলা চর্চাকে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে যাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে তাঁরা হলেন– কাইয়ুম চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, মূর্তজা বশীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদুল বাসেত, হামিদুর রহমান, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, হাশেম খান, রফিকুন নবী, নিতুন কুন্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, আবু তাহের, মাহমুদুল হক, মনিরুল ইসলাম, আবুল বারক আলভী প্রমুখ।

নমুনা প্রশ্ন

শুদ্ধ বাক্যে টিক চিহ্ন (√) দাও।

১. যারা ছবি আঁকেন তাঁরা হলেন– নাট্যশিল্পী/ চিত্রশিল্পী/ নৃত্যশিল্পী

২. যারা নাটকে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তাঁরা– কারুশিল্পী/ অভিনেতা/ চিত্রশিল্পী

৩. যারা চমৎকার গান গাইতে পারেন তাঁরা হলেন– অভিনেতা/ সংগীতশিল্পী/ নাট্যশিল্পী

৪. শিশুকে ছবি আঁকা শেখাবার জন্য প্রথমেই– ভালো করে নিয়ম–কানুন শিখিয়ে দিতে হয়/ প্রথমেই নিজের ইচ্ছেমতো আঁকতে দিতে হয়।

৫. সাধারণত– ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে ধীরে ধীরে ছবি আঁকার নিয়ম–কানুনগুলো জেনে শিশুরা ছবি আঁকবে/ প্রথম শ্রেণি থেকে নিয়মকানুন জেনে ছবি আঁকবে।

৬. আদিম মানুষেরা– ক্যানভাসে ছবি আঁকত/ গুহার গায়ে ছবি আঁকত/ কাগজে ছবি আঁকত।

৭. আদিম মানুষেরা ছবি আঁকার রং–তুলি– শহরের দোকান থেকে সংগ্রহ করত/ নিজেরা মাটি, পশুর চর্বি ও পাথর সুঁচালো করে তৈরি করে নিত।

৮. প্রায় পনেরো–ষোলো শতক পর্যন্ত শিল্পীরা–বড়ো বড়ো আর্ট কলেজে গিয়ে ছবি আঁকা শিখত/গুরু বা শিল্প শিক্ষকের ছবি আঁকার কাজে সহায়তা করতে গিয়ে গুরুর কাছেই শিখে নিত।

৯. পাকিস্তান সরকার – নিজেরাই আর্ট কলেজ তৈরি করে তারপর শিল্পীদের ডাকেন/ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, সফিউদ্দিন আহমেদ, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন প্রমুখদের দাবির কারণে শিল্পশিক্ষার প্রতিষ্ঠান শুরু করেন।

১০. ছবি আঁকা শেখার প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল– গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ/ গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট।

১১. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়– ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭/ ১৫ই নভেম্বর ১৯৪৮/ ২২শে আগস্ট ১৯৪৮।

১২. শিল্পকলা শিক্ষার নিজস্ব ভবন– বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদেই গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউটটির ক্লাস শুরু হয়/ নবাবপুরে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের মাত্র ২টি কামরায় শুরু হয়।

১৩. উন্নত সমাজ গঠনে প্রকৌশলী, ডাক্তার ও বিজ্ঞানীর মতো– চিত্রশিল্পীদেরও ভূমিকা রয়েছে/ চিত্র শিল্পীরা শুধু নিজেদের জন্য ও প্রদর্শনী করার জন্য ছবি আঁকে।

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. শিশু বয়সে ও বিদ্যালয়ে পড়ার সময় কীভাবে ছবি আঁকবে?

২. বর্তমান বাংলাদেশে বা পূর্ব – পাকিস্তানে কীভাবে, কোন সময়ে এবং কাদের চেষ্টায় শিল্পকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির প্রথম নাম কী ছিল?

৩. গভর্নমেন্ট আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পীরা সরকারকে কোন কোন উদাহরণ দিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝিয়েছিলেন?

৪. প্রথম বছর কতজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিল? তাঁদের সম্পর্কে লেখো।

৫. প্রথম ১২ বছরে শিক্ষা লাভ করে কোন কোন শিল্পীরা দেশের সংস্কৃতি বিকাশে ও শিল্পকলা শিক্ষায় অবদান রেখেছেন?

৬. ছবি আঁকতে গিয়ে তোমার কী কী অনুভূতি কাজ করে?

৭. চারু ও কারুকলা চর্চার গুরুত্বসমূহ কী কী?

৮. মহান মুক্তিযুদ্ধে চিত্রশিল্পীদের অবদান কী?

দ্বিতীয় অধ্যায়

চিত্রকলা সর্বকালে সব মানুষের ভাষা

পারিসের এক রেস্তোরায় খাবার খেতে গিয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদিন তাঁর খাতার কাগজে এঁকে বুঝিয়ে ছিলেন তিনি কী কী জিনিস খাবেন। সিদ্ধ খাবেন না ভাজি–তাও এঁকে বুঝিয়ে দিলেন। মদ খাবেন না, সেটাও আঁকলেন। এভাবেই ইংরেজি না জানা হোটেল বয়কে তিনি খাবারের অর্ডার দিয়েছিলেন।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা–

- সভ্যতার প্রথম ভাগে মানুষ যে চিত্রের সাহায্যে ভাব প্রকাশ করেছিল তা জানতে পারব।
- চিত্রকলা বা ছবির ভাষা দিয়ে কীভাবে সারা বিশ্বের মানুষ ভাব বিনিময় করতে পারে তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

মানুষ আদিকালের সেই গুহাজীবন থেকে শুরু করে কত দিক থেকে কতভাবে জয় করতে শিখল পৃথিবীকে। মানুষ কোথা থেকে শুরু করে আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে ! শুধু প্রকৃতির সাথে সম্পর্ক নিয়েই তো মানুষের চলবে না। মূল সমস্যা হলো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। আদিম মানুষ যখন প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় জীবন ও জীবিকার জন্য সংগ্রাম করত এবং হিংস্র পশুদের আক্রমণের ভয়ে সবসময় আতঙ্কে থাকত। মুক্তির উপায় হিসেবে জাদু বিশ্বাস নিয়ে পাহাড়ের গায়ে বিচিত্র আঁচড় কেটে ছবি এঁকে সংঘবদ্ধ হয়ে সেইসব প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। কিন্তু কেন মানুষ ছবি এঁকেছিল? সেই রহস্যের কথা আমরা এখন জানব।

আলতামিরা গুহাচিত্র

১৮৭৯ সালের কথা। স্পেনের উত্তরাঞ্চলে সাউটুলা নামে এক জমিদার বাস করতেন। তাঁর জমিদারি বেশ বড়ো। সেখানে ছিল অনেক পাহাড়। এখানে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন একটি গুহার। গুহার মধ্যে সন্ধান চালিয়ে কিছু পাওয়া যায় কিনা এ খেয়ালের বশে একদিন খনন কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ভাবলেন গুহার মধ্যে খুঁজে যদি সেই আদিম মানুষদের হাড়গোড় আর পাথরের হাতিয়ার পাওয়া যায়। যথারীতি খুঁজতে শুরু করে দিলেন। সাথে তার পাঁচ বছরের ছোটো মেয়ে। সে অবশ্য অতসব বোঝে না। সে বেরুলো বাবার হাত ধরে একটুখানি ঘুরে আসতে।

গুহায় ঢুকে বাবা হাড়গোড় আর হাতিয়ার খুঁজতে লেগে গেলেন। কিন্তু ওইটুকু মেয়েটির এসব ব্যাপার ভালো লাগল না। সে একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে গুহার মধ্যে একটু-আধটু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার চোখ পড়ল গুহাটার এক জায়গায়। আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চিৎকার করে বলে উঠল বাবা, ষাঁড়! ষাঁড়! মেয়ের চিৎকার শুনে বাবা ছুটে এলেন, ভাবলেন গুহার মধ্যে সত্যিই কি ষাঁড় বেরিয়েছে?

না। ঠিক ষাঁড় নয়। তবু ঠিক ষাঁড়ের মতোই। ষাঁড়ের ছবি। ছোটো এই মেয়েটির আবিষ্কারের কথা জানাজানি হয়ে গেল। বড়ো বড়ো পন্ডিতেরা ওই আলতামিরা গুহায় গিয়ে হাজির। তারপর চলল প্রায় ষোলো বছর ধরে পন্ডিত মহলে ওই ষাঁড়ের ছবি নিয়ে এক তর্ক-বিতর্ক, গবেষণা। আদিম মানুষের আঁকা প্রথম যে ছবি আবিষ্কার হয়েছিল তার বয়স প্রায় বিশ হাজার বছর। স্পেনের আলতামিরা, ফ্রান্সের লামুতে এবং লাসকো পর্বতগুহায় পাওয়া গেছে এর অস্তিত্ব। জীবনযাপন ও জীবনধারণের তাগিদে তারা ছবি আঁকাও শিখেছে। তারা মনের ভাব প্রকাশ করেছে ইশারায়, বিভিন্ন চিহ্ন এঁকে। এমন সময় ১৮৯৫-এ স্পেনে আবিষ্কার হলো আরও একটি গুহা। সেখানের গুহার দেয়ালে আবিষ্কৃত হলো তাদের অনেক আঁকা-জোকা। কারা আঁকল এসব ছবি? নিশ্চয়ই সেই প্রাচীন যুগের মানুষেরা। সেই আদিম মানুষেরাই ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্রথম ছবির ব্যবহার শুরু করেছিল।

পাঠ : ২

ফ্রান্স, স্পেন, উত্তর –আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের আরও অনেক আদিম মানুষের আঁকা গুহাচিত্র পাওয়া গিয়েছে। আর পণ্ডিতেরা আনুমানিক হিসেব করে বলেছেন কোনো কোনো ছবির বয়স খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে ৩০,০০০ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব।

এই গল্পটির মধ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম ভাব প্রকাশের প্রথম বাহন হিসেবে আদিম মানুষ ছবিকেই বেছে নিয়েছিল।

আজকের পৃথিবীর বুকে নানান দেশ, নানান দেশে নানান ধরনের মানুষ আবার তাদের ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। একজন মানুষের পক্ষে কখনো জানা সম্ভব হয়ে উঠে না ঐসব ভাষা। কিন্তু সেই দেশের জীবন, পরিবেশ ও প্রকৃতি নিয়ে যদি কোনো ছবি আঁকা হয় তাহলে অতি সহজেই সেই ছবি দেখে সেই দেশ সম্পর্কে জানা যাবে।

মনে কর আমাদের দেশে কোনো উৎসব উপলক্ষে জাপান, চীনসহ আরও অনেক দেশের শিশুরা সমবেত হয়েছে। শুভেচ্ছা বিনিময় হয়ত আমরা সবাই সবার সাথে করতে পারব। কিন্তু নিজ নিজ দেশের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি আমরা নিজ নিজ ভাষায় ব্যক্ত করি তাহলে ভাষা না জানার কারণে তা জানতে পারব না। যদি আমরা নিজের দেশের পরিবেশ, প্রকৃতি, জীবন ও সংস্কৃতির বিষয়ে ছবি আঁকি তাহলে সেই ছবির বর্ণনার মাঝে আমরা প্রতিটি দেশের সার্বিক একটা চিত্র প্রত্যেকের ছবির মাঝে ফুটে উঠবে সেই দেশের পরিচয় ও জীবনধারা।

তাই একমাত্র ছবি বা চিত্রকলার ভাষা দিয়ে পৃথিবীর যে কোনো দেশ, যে কোনো জাতি, যে কোনো মানুষের সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আমরা সহজেই বুঝতে পারি আর এ কারণেই বলা যেতে পারে চিত্রকলাই হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা।

কাজ: চিত্রকলা যে আন্তর্জাতিক ভাষা দশটি বাক্যে তা প্রকাশ কর।

পাঠ : ৩

পৃথিবীর বিখ্যাত শিল্পী ও শিল্পকর্ম

আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত শিল্পী কত শত ছবি এঁকেছে। গুহাচিত্রের সেইসব শিল্পীর নাম যেমন আমাদের অজানা রয়ে গেছে। তেমনি পরবর্তী সময়ে কত দেশে কত শিল্পী ছবি এঁকেছে। সেইসব শিল্পীর মাঝ থেকে কেউ কেউ তাঁদের শিল্পসৃষ্টি দিয়ে জগৎ বিখ্যাত হয়েছেন। এই উপমহাদেশেও অনেক বরেণ্য শিল্পী শিল্পসৃষ্টি করে চিত্রকলার ইতিহাসে আসন করে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু প্রমুখ। তেমনি আমাদের দেশের পথিকৃৎ শিল্পীদের মধ্যে আছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, এস.এম সুলতান, আনোয়ারুল হক। তাঁদের পরবর্তী সময়ে যে সকল স্বনামধন্য শিল্পী এ যাত্রাকে অব্যাহত রেখেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, হামিদুর রহমান, মুর্তজা বশীর, মুস্তাফা মনোয়ার, রশীদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, আব্দুর রাজ্জাক, আবদুল বাসেত, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুন্ডু, হাশেম খান, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

পৃথিবীতে যে সকল শিল্পী তাঁদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্য দিয়ে বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের কয়েকজনের জীবন ও তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে এবারে আমরা জানব।

পাঠ : ৪

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২–১৫১৯)

ইতালির ফ্লোরেন্স থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরে ভিঞ্চি নামক একটি ছোটো শহরে ১৪৫২ খ্রিষ্টাব্দে আনচিআনো নামক গ্রামে লিওনার্দোর জন্ম হয়। পিতা পাইরো দ্য ভিঞ্চি একজন বিশিষ্ট বিত্তশালী। তাঁর মাতার নাম ক্যাটরিনা। অটুট স্বাস্থ্য ও রূপের অধিকারী ছিল এই শিশু। পিতা পাইরো পুত্রের উন্নতির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন। বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে লিওনার্দো প্রতিপালিত ও বেড়ে উঠেছেন। দুঃখের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি কখনও। যে সময় লিওনার্দোর জন্ম হয়েছিল তখন ইতালির রেনেসাঁস বা নবজাগরণ। এই সময় ইউরোপে এক বৈপ্লবিক যুগ আরম্ভ হয়েছিল।

শিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

অশ্বারোহণ, সংগীত, চিত্র, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, স্থাপত্য ও গণিতশাস্ত্রে ছিল লিওনার্দোর গভীর অনুরাগ। ভিঞ্চি তাঁর ছবির নানা দিক নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। আকাশে উড়ন্ত পাখিদের গতি, ভারসাম্য ও দিক পরিবর্তন লক্ষ করে তিনি বর্তমান যুগের উড়োজাহাজের আকৃতিবিশিষ্ট এক যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। অঙ্কনে মানবদেহের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে যথাযথ উপায় খুঁজে পেতে মৃতদেহ কেটে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে দেখতেও বাদ

রাখেন নি। শিল্পকলার ইতিহাস ছাড়াও অন্যান্য দিক দিয়ে তাঁর যে গবেষণা ছিল তা পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের বহু আবিষ্কারে ভূমিকা রেখেছে। নানা বিষয়ে অসংখ্য অঙ্কন তিনি রেখে গেছেন।

শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা ছবি 'মোনালিসা'

বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে তিনি প্রচুর গবেষণা করেছেন। তাঁর চিন্তাচেতনার ফসলের সূত্র থেকেই পরবর্তীকালের আকাশযান, স্থলযান ও জলযানের জন্ম, যা আধুনিক বিশ্বের বিস্ময়।

তাঁর জগৎবিখ্যাত শিল্পকর্মের মধ্যে মোনালিসা একখানি বিখ্যাত চিত্রকর্ম। ছবিটি এখন লুভর প্রাসাদ মিউজিয়ামের সম্পত্তি। এর দৈর্ঘ্য তিন ফুট, প্রস্থ দুই ফুট। এই মহিলা ইতালির ফান্সোস্কো দেল জকন্দো নামক এক ব্যক্তির পঁচিশ বছর বয়স্কা পত্নী। তাঁর মুখের সেই রহস্যময় হাসি আজও আমাদের কৌতূহলী করে। এছাড়াও তাঁর আরও বিখ্যাত ছবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো অ্যাডোরেশন অব দ্য কিংস, ভার্জিন অব দ্য রকস, ম্যাডোনা, শিশু ও সেন্ট অ্যানি। ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে ২রা মে, ৬৭ বছর বয়সে এই মহান শিল্পী মহাপ্রস্থান করেন।

কাজ : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কি শুধু চিত্রশিল্পী? তাঁর আর কী কী পরিচয় আছে– সকলে ৬টি বাক্যে লিখে দেখাও।

পাঠ : ৫

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫–১৫৬৪)

১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী ক্যাসেল ক্যাপরিজ নামক একটি ক্ষুদ্র শহরে মাইকেল এঞ্জেলোর জন্ম হয়। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে চিত্রকলা ভাস্কর্য স্থাপত্য ও কলাবিদ্যার প্রতি পুত্রের আকর্ষণ লক্ষ করে পিতা পুত্রকে ১৩ বছর বয়সে ঘিরল্যান্ডো এর নিকট শিল্পশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। এখানে তিনি মাত্র তিন বছর শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন। ঘিরল্যান্ডো এর নিকট আগমনের পূর্ব থেকেই ভাস্কর্যে, মাইকেল এঞ্জেলোর যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। এখানে ভাস্কর্য, চিত্র ও স্থাপত্য বিষয়েও তিনি জ্ঞান লাভ করেন।

শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো

শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর তৈরি বিখ্যাত ভাস্কর্য 'লা–পিয়েটা'

মানুষের ছবি আঁকায়, ভাস্কর্য সৃষ্টিতে এবং তার নিখুঁত সুন্দর লাবণ্য ফুটিয়ে তুলতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। মাইকেল এঞ্জেলোর জীবন লিওনার্দোর ন্যায় সুখে অতিবাহিত হয়নি। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে তিনি শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, অর্থ ও যশ অর্জন করেছিলেন। শিল্পী জীবনের বিভিন্ন ঘাত–প্রতিঘাত নিয়ে শেষ জীবন পর্যন্ত দুঃখই পেয়েছেন। তবুও নিজের সৃষ্টির উপর গভীর আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল তাঁর। মানবদেহের মাংসপেশীর গড়ন, গতি–প্রকৃতির আসল রূপ দেখার জন্য শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো তিনিও মৃতদেহকে কেটে দেখেছেন। সে অভিজ্ঞতার ফল তার আঁকা ছবি বা ভাস্কর্যে নজর দিলে সহজেই বোঝা যায়। শিল্পকর্মে তিনি মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ বা অংশ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতেন। মাইকেল এঞ্জেলো ছবির চেয়ে ভাস্কর্য কর্মকেই অধিক পছন্দ করতেন এবং ভাস্কর্য কর্মের জন্যই তিনি অধিক বিখ্যাত। মূর্তিগুলি ধাতু ও প্রস্তরে নির্মিত হতো। তাঁর পিয়েটা ভাস্কর্য জগতে এক অবিনশ্বর সৃষ্টি। এই মূর্তিটি এখন রোমের সেন্ট পিটার্স গির্জার সম্পত্তি। ডেভিড মূর্তিটি ফ্লোরেন্সের একাডেমিতে আছে। বড় স্লেভ আছে ল্যুভর মিউজিয়ামে।

শুধু ভাস্কর্য সৃষ্টিতেই নয়, চিত্রাঙ্কনেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। ভ্যাটিক্যানের সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদে এবং দেয়ালের গায়ে মাইকেল এঞ্জেলো যে ফ্রেসকো এঁকেছিলেন তাঁর সে কাজগুলো আজও সকলে বিস্ময় নিয়ে দেখে। এখানের চিত্রকলার সুন্দর রূপ দিতে তিনি ভাস্কর্যের আকার–আকৃতি ও কলাকৌশল ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ মূর্তি নির্মাণের মতো সেখানেও তেমনি মানবদেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। মাইকেল তাঁর কাজে পূর্বের প্রচলিত নিয়মকানুন, ধ্যানধারণা সব বদলে দিলেন। তাঁর শিল্পকর্মে সৃষ্টি করলেন নতুন চমক। তাঁর এ রকম শিল্পকর্মগুলো অতুলনীয় এবং রূপলাবণ্য ও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। আদমকে জীবন দানের চিত্রটি সিসটাইন চ্যাপেলের ছাদে আঁকা রয়েছে তাতে আছে আশ্চর্যজনক দরদ সৃষ্টির পরিচয়। পরবর্তীকালে লাস্ট জাজমেন্ট ছবিটি এঁকেছিলেন।

মাইকেল এঞ্জেলো ছিলেন চিরকুমার। সাধু–সন্ন্যাসীদের ন্যায় জীবনযাপন করেছিলেন। শেষ বয়সে শিল্পী মাইকেল অত্যন্ত খিটখিটে হলেও জনসাধারণ তাঁর প্রতিভার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি এঞ্জেলো বিখ্যাত পিয়েটা মূর্তির পায়ের কিছু অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৭ তারিখ ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দেয়া হয়। তখন পূর্ণজ্ঞানে একটা উইল করার কথা বলেন। তাতে লেখা হয় 'আমার আত্মা ঈশ্বরের জন্য রইল, দেহ রইল পৃথিবীর জন্য' বেলা পাঁচটায় এই মহান শিল্পী ৮৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।

পাঠ : ৬

রাফায়েল সানজিও (১৪৮৩–১৫২০)

র‍্যাফেল আরবিনো নামক একটি পার্বত্য শহরে ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে গুড ফ্রাইডে তিথিতে রাত্রি ৯টায় জন্মগ্রহণ করেন। রাফায়েলের পিতা জিওভানি সানতিও ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। রাফায়েল পিতার কাছেই ছবি আঁকার প্রথম অনুশীলন আরম্ভ করেন। দশ বছর বয়সে তিনি পিতার আঁকা ছবির উপর তুলি চালানোর অধিকার লাভ করেন। পিতা জিওভানি পুত্রের ষোলো বছর বয়সে তাঁকে তৎকালীন খ্যাতিমান শিল্পী পেরুজীনোর নিকট প্রেরণ করেন। মাত্র তিন বছরে সেখানে তাঁর একাগ্রতা এবং অধ্যবসায়ের ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পীসমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। রাফায়েলের সর্বোচ্চ মূল্যবান উদ্ভাবন হলো ছবি আঁকার বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সাজানো। একমাত্র তাঁর শিল্পকর্মে এ মূল্যবান উপায়টি দেখা যেত। আর কারো চিত্রকলায় যা দেখা যায় না।

শিল্পী রাফায়েল সানজিও

রাফায়েল ছিলেন একজন অতি সুদর্শন পুরুষ। চরিত্রেও তেমনি ভদ্রতা, নম্রতা, বিনয়, শালীনতা ও পরোপকারী ছিলেন। একবার যিনি এই শিল্পীর সংস্পর্শে আসতেন তিনিই আনন্দিত হতেন। যৌবনের প্রথমে যশ ও অর্থ দুই তিনি পেয়েছিলেন। কিন্তু যশ বা অর্থের মোহ তাঁর স্বভাবকে কখনও প্রভাবিত করতে পারেনি। রাফায়েল ও লিওনার্দোর দুই মহান শিল্পীই ছিলেন পরম কৌতূহলপ্রবণ। বিশ্বের রহস্য উদঘাটনে একজন ছিলেন গবেষক অপরদিকে রাফায়েল ছিলেন সত্য অনুসন্ধানে যত্নশীল।

রেনেসাঁস যুগে লিওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো ও রাফায়েল এই তিন মহান শিল্পী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করেন। তাঁরা আলোছায়া ও পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলন করে পরবর্তী রেনেসাঁস চিত্ররীতির মধ্যে নতুন দীপ্তি দান করেছিলেন।

শিল্পী রাফায়েল এর আঁকা ছবি 'ম্যাডোনা'

তাঁর বিখ্যাত শিল্প সৃষ্টির মধ্যে প্রান্তরে উপবিষ্ট ম্যাডোনা ছবিটি সৌন্দর্যের অতুলনীয় সৃষ্টি। রাফায়েলের সাধক জীবন সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। রোম নগর যখন রাফায়েলের জয়গানে মুখরিত তখন তাঁর শত্রুপক্ষ তাঁকে হত্যা করার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করেছিল। রাফায়েল ঘরের দরজা খোলা রেখেই মাতৃমূর্তি ছবিটি তখন আঁকছিলেন। ঘাতকদ্বয় ছবি আঁকা দেখে তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যান। শিল্পীও তাঁর স্বভাবসুলভভাবে খুব যত্ন ও আপ্যায়ন করে তাদের নিকট ছবির ব্যাখ্যা করতে থাকেন। ঘাতকদ্বয় রাফায়েলের ব্যবহারে এতই অভিভূত হন যে তাদের পাপ উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ করে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে প্রস্থান করেন।

১৫২০ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে গুড ফ্রাইডে তিথিতে (জন্মদিনে) এই মহান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

কাজ : রাফায়েলের স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ে দশটি বাক্যে সকলে লিখে দেখাও।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি জন্মগ্রহণ করেন কত সালে?

ক) ১৪৫২ সালে খ) ১৪৪২ সালে

গ) ১৫৫০ সালে ঘ) ১৪৮০ সালে

২. কোন শিল্পী চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে সমান দক্ষ ছিলেন?

ক) লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি খ) রাফায়েল

গ) মাইকেল এঞ্জেলো ঘ) পল সেজান

৩. প্রান্তরে উপবিষ্ট ম্যাডোনা ছবিটি কার আঁকা?

ক) ভ্যানগঘ খ) রাফায়েল

গ) মাতিস ঘ) মাইকেল এঞ্জেলো

৪. আদিম মানুষের আঁকা প্রথম ছবিটি আবিষ্কার হয়েছিল– আনুমানিক তা প্রায় –

ক) ১০ হাজার বছর আগে খ) ২০ হাজার বছর আগে

গ) ৩০ হাজার বছর আগে ঘ) ৪০ হাজার বছর আগে।

৫. আলতামিরা গুহাটি কোথায়?

ক) ফ্রান্সে খ) স্পেনে

গ) জার্মানে ঘ) জাপানে

সংক্ষেপে উত্তর দাও।

১. চিত্রকলাকে আন্তর্জাতিক ভাষা বলার পক্ষে তোমার মতামত দাও।
২. তিনি শুধু চিত্রশিল্পীই নন একাধারে বহু আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারক–শিল্পী সম্পর্ক যা জান লেখো।
৩. শুধু চিত্রকলাই নয় ভাস্কর্যেও ছিলে সমান পারদর্শী–শিল্পীর নাম ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
৪. ছবি আঁকার বষয়বস্তু যথাযথভাবে সাজানো-এ মূল্যবান উদ্ভাবন কোন শিল্পী করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে লেখো।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্প

বাংলাদেশের মানুষ, প্রকৃতি ও জীবনযাপনের সাথে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের লোকশিল্প ও কারুশিল্প। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে জানব এবং আমাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করব।

বাংলাদেশের লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ছবি

এ অধ্যায় পাঠ শেষ করলে আমরা–

- বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্পের বিবরণ দিতে পারব।
- বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি কারুশিল্পের বর্ণনা করতে পারব।
- লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহের বর্ণনা করতে পারব।
- আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব।
- লোকশিল্প ও কারুশিল্পের তালিকা দিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি লোকশিল্প

বাংলাদেশের লোকশিল্পের ভুবন অনেক বিস্তৃত। আলপনা, নকশিপিঠা, নকশিসাঁচ, নকশিপাখা, শীতল পাটি, নকশিকাঁথা, নকশিশিকা, লোকচিত্র, খেলনা, পুতুল,শোলার কাজ,বাঁশ–বেতের বেড়া, লোক–অলঙ্কার, লোকবাদ্যযন্ত্র, পোড়ামাটির ফলকচিত্র প্রভৃতি নিয়ে বাংলাদেশের লোকশিল্পের বিচিত্র জগৎ।

বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান ও উৎসবে বিভিন্নরকম লোকচিত্র তৈরি করা হয়। এর মধ্যে আছে মহররম সম্পর্কিত চিত্র, পটচিত্র, ঘটচিত্র, সরাচিত্র, দেয়ালচিত্র, মুখোশচিত্র, পিঁড়িচিত্র ইত্যাদি। এ সমস্ত লোকচিত্র আমাদের লোকশিল্পের অংশ। বাংলাদেশের এসব বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকশিল্পগুলোর মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

আলপনা

আলপনা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান লোকশিল্প। বাঙালির বিভিন্ন উৎসবে আলপনা আঁকা হয়। এখন নববর্ষের অনুষ্ঠান, জন্মদিন, বিয়ে, গায়ে হলুদ এবং ২১শে ফেব্রুয়ারিতে শহিদ মিনারস্থল ও সড়কে আমরা আলপনার ব্যবহার দেখতে পাই। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠান, উৎসবের সৌন্দর্য ও জাঁকজমক বাড়িয়ে দিতে আমরা আলপনার ব্যবহার করি। যে কোনো শুভ কাজে আলপনা আঁকা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য ও অনেক প্রাচীন একটি রীতি। এর উদ্ভব হয়েছিল মূলত প্রাচীন বাঙালি লোকজীবনের ধর্ম ও জাদু বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। বিভিন্ন প্রকার পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠানে আলপনা আঁকা হতো। যেমন লক্ষীপূজায় গোলাকার আকৃতির আলপনা দেবীর আসন বা বেদী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আলপনায় বহুল ব্যবহৃত একটি মোটিফ হচ্ছে কল্কি। কল্কি এখানে লক্ষীর ধনভাণ্ডারের ধানে ভর্তি প্রতীক চিহ্ন। এই প্রতীক বা রূপক চিহ্ন দিয়ে আলপনা এঁকে লক্ষীদেবীর পূজা করলে সংসারে সমৃদ্ধি আসবে। ধানে গোলা পরিপূর্ণ থাকবে। এই বিশ্বাস থেকে এমন আলপনা আঁকা হতো।

আলপনা

অন্যদিকে আমরা সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে যা পাবার আশা করি বা চেষ্টা করি সে আশা পূরণের জন্য করা হতো ব্রতের অনুষ্ঠান। এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ও আলপনা আঁকা হতো। ব্রতের আলপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন

মোটিফগুলো ছিল মনের কামনার এক– একটি প্রতীক। পরবর্তী সময়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে আলপনা বাঙালির সকল ধর্ম–বর্ণের মানুষের শুভ অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে ওঠে। এখন বিভিন্ন লোকজ মোটিফ যেমন–ফুল, পাতা, মাছ, পাখি ইত্যাদি এবং নানা রকম জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক আকৃতির ব্যবহার করে আলপনা আঁকা হয়। পানিতে চালের গুঁড়া মিশিয়ে পিঠালি তৈরি করে তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে উঠানে, ঘরের বারান্দায় ও মেঝেতে আলপনা আঁকা হয়। চালের গুঁড়া ছিটিয়ে তার ওপর আঙ্গুল দিয়ে আলপনা আঁকার একটি প্রাচীন রীতি ছিল। ডালের গুঁড়া, পোড়া তুষ, ইটের গুঁড়া প্রভৃতি দিয়ে আলপনায় রঙের বৈচিত্র্য আনা হতো। গতানুগতিকতা ও বাঁধাধরা কিছু আকার–আকৃতি আলপনার একটি বিশেষ দিক হিসেবে গণ্য হতো। এই বাঁধাধরা আকার–আকৃতি বা নকশাকে মোটিফ বলে। তবে আধুনিককালে আলপনা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আঙ্গিক ও মোটিফের ক্ষেত্রে এসেছে পরিবর্তন। রঙের ব্যবহারে এসেছে বৈচিত্র্য। এখন প্লাস্টিক রং ও বিভিন্ন রঙের অক্সাইড এর সাথে আইকা গাম মিশিয়ে তুলি দিয়ে আলপনা করা হয়।

সরাচিত্র

চিত্রিত বিভিন্ন প্রকার সরা লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। পাতিলের ঢাকনার নাম সরা। রান্নাঘরের কাজে ব্যবহৃত এ রকম সরা চিত্রিত হয় না। তবে এ ধরনের সরাচিত্র আঁকা হয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বিয়ে অনুষ্ঠানের উপকরণ হিসেবে। সরাতে সাধারণত পদ্ম, প্রজাপতি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য চিত্র আঁকা হয়। তবে সরাচিত্রের সব থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে লক্ষ্মীসরা। লক্ষ্মীপূজায় লক্ষ্মীসরা প্রধান উপকরণ। পূজার শেষে তা গৃহসজ্জার জন্য ঘরে রাখা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের লক্ষ্মীসরা দেখা যায়। লক্ষ্মীসরাতে দেবী দুর্গার ছবির সাথে লক্ষ্মীর ছবি থাকে। সাথে লক্ষ্মী দেবীর বাহন পেঁচার ছবিও থাকে। লোকজ রীতিতে উজ্জ্বল বিভিন্ন রং দিয়ে এসব ছবি আঁকা হয়। বর্তমানে সরাচিত্র আর শুধু ধর্মীয় বিষয়ে আবদ্ধ নয়। এখন বিভিন্ন লোকজ বিষয় ও নানারকম নকশা দিয়ে সরা আঁকা হয়। এসব সরা বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সাজসজ্জার কাজে ব্যবহার করা হয় এবং গৃহসজ্জাতেও ব্যবহার করা হয়। তাই এসব সরাচিত্র আমাদের লোকসংস্কৃতির অংশ।

লক্ষ্মীসরা

পাঠ : ২

পট

১০৮ বাংলার লোকশিল্পের অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে পট। বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে

আঁকা হতো। পট্ট বা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি। জড়ানো পট ও চৌকা পট–এ দুই ধরনের আঁকা হতো। আর এর শিল্পীরা পটুয়া নামে পরিচিত। জড়ানো পট বেশ বড়ো ও লম্বা আকারের হয়ে থাকে। একটা পটে পর পর লম্বাভাবে সাজানো থাকে অনেকগুলো টুকরো ছবি। এ ছবিগুলো কোনো লোককাহিনি বা ধর্মীয় কাহিনির চিত্ররূপ। বুদ্ধের জীবনী, জাতকের গল্প, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা–লক্ষীন্দরের কাহিনি, মহররমের কাহিনি, সোনাই–মাধব এরকম বহু বিষয়ের উপর পট আঁকা হতো। পরবর্তীকালে লৌকিক পির গাজীর জীবনের গল্প, কালুগাজী–চম্পাবতীর গল্প নিয়েও পট আঁকা হয়েছে। এগুলো গাজীর পট নামে খ্যাত।

গাজীর পট

এই পটগুলোর দু প্রান্তে দুটি কাঠি লাগিয়ে তার সাথে জড়িয়ে রাখা হতো। কাপড়ের ওপর কাগজ লাগিয়ে তার ওপর চিত্র আঁকা হতো। তাছাড়া কাপড়ের ওপর আঠালো রং দিয়েও চিত্র আঁকা হতো। গ্রামে কিছু লোক এই পট নিয়ে ঘুরে ঘুরে পটের গল্প সুন্দর সুর করে বর্ণনা করেন। ছেলে–বুড়ো ও মেয়েরা সবাই ভিড় করে এসব পটের গল্প–কাহিনি শোনেন এবং খুব আনন্দ পান।

চৌক পট ছোটো আকারের কাগজের ওপর আঁকা চিত্র। সাধারণত ১ ফুট লম্বা ও ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি চওড়া হয়। এগুলোর মধ্যে কালীঘাটের পট ছিল বিখ্যাত। কালীঘাটের পটের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও শিল্পমান ছিল অসাধারণ। এগুলোতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনযাপনের ভালোমন্দ দিক, সামাজিক আচার–অনাচার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদির চিত্রায়ন করা হতো। মৃত ব্যক্তির স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য চক্ষুদান পট নামে একরকম পট আঁকতেন পটুয়ারা। মৃত ব্যক্তির চক্ষুবিহীন ছবি এঁকে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাতে চোখ এঁকে দেওয়া হতো। যাতে করে সে স্বর্গের পথ দেখতে পায়।

পাঠ : ৩

নকশিকাঁথা

নকশিকাঁথা বাংলাদেশের লোকশিল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় নিদর্শন। শীতকালে গায়ে দেওয়ার জন্য কাপড় কয়েক পরত একসঙ্গে সাজিয়ে কাঁথা সেলাই করা হয়। এর মধ্যে কিছু কাঁথা তৈরি করা হয় নানা রঙের সুতায়, নানারকম নকশা করে। অনেক নকশা দিয়ে যে কাঁথা সেলাই হয় সেটাই হলো নকশিকাঁথা। গাঁয়ের মেয়েরা কাজের অবসরে দিনের পর দিন খেটে সুঁই–সুতায়, রং–বেরঙের ছবি ও নকশা

নকশিকাঁথা

কাঁথায় ফুটিয়ে তোলে। এসব ছবিতে থাকে অনেক গল্প, অনেক কাহিনি। গাঁয়ের বধূ তার নিজের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা সুঁই-সুতার ছবির মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তোলে। এক-একটি কাঁথা বানাতে এক বছর, কখনো কখনো দুই বছর সময় পেরিয়ে যায়। এক-একটি কাঁথার শিল্পনৈপুণ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। কাঁথাতে যেসব নকশা থাকে তা হলো- ফুল, পাতা, গাছ-পালা, পদ্ম, চাঁদ, তারা, পাখি, মাছ, নানারকম জীবজন্তু এমনকি ঘরবাড়ি ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু কাঁথাতে রেখা, বৃত্ত, গোলাকার ঘর, তিনকোনা ঘর এসব আদল বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করা হয়। একই আদল বা নকশার বারবার ব্যবহারকে 'মোটিফ' বলে। ব্যবহারিক দিক থেকে নকশিকাঁথাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

সুজনিপেড়ে, লেপকাঁথা, চাদর কাঁথা, জায়নামাজ, আসন কাঁথা, পালকির কাঁথা, রুমাল কাঁথা ইত্যাদি। বাংলাদেশে নকশিকাঁথা সেলাইয়ের দুটি মূলধারা বা রীতি আছে। তার একটি হলো যশোর রীতি, অন্যটি রাজশাহী রীতি।

তাছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও নকশিকাঁথার উল্লেখযোগ্য ধারা আছে। যশোর অঞ্চলের নকশিকাঁথা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানে অবস্থিত । এ অঞ্চলের কাঁথার ফোঁড় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, রং রুচিসম্মত। গ্রামীণ মেলায় এই কাঁথা কোনোদিন বিক্রি হয় না। নিজেদের উদ্দেশ্যে এই কাঁথা তৈরি হয়। তবে অপরের ফরমাসে পারিশ্রমিকের বিনিময়েও নকশিকাঁথা তৈরি করা হয়। আজকাল শহরের কারুশিল্পের দোকানে নকশিকাঁথা বেচাকেনা হতে দেখা যায়। এমনকি বিদেশের বাজারেও আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পের বিক্রয় হয়ে থাকে।

পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা টেরাকোটা

টেরাকোটা

পোড়ামাটির ফলক বাংলাদেশের আদি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এবং খুবই বিখ্যাত। মধ্যযুগে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনাতে, বিশেষ করে মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির দেয়ালে এ ফলকচিত্র ব্যবহার করা হতো। পোড়ামাটির ফলকচিত্র বা Terracotta হচ্ছে মাটির পাটাতনের বা ফলকের সমান জমিনের উপর ছবি বা নকশা উঁচু উঁচু হয়ে থাকে এমন রিলিফ ওয়ার্ক। এটা বানানোর জন্য প্রথমে কাঁচা মাটি দিয়ে ফলকগুলো তৈরি করে তারপর পুড়িয়ে নেওয়া হয়। তাই এগুলোকে বলে পোড়ামাটির ফলক। বগুড়ার মহাস্থানগড়ে তথা প্রাচীন পুন্ড্র নগরীর প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীনতম ফলকচিত্র পাওয়া গেছে। মহাস্থানগড়ের এবং দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের ফলকচিত্রের বিষয়বস্তু নরনারী ও দেবদেবী। অন্যদিকে পাহাড়পুর ও কুমিল্লার ময়নামতির ফলকগুলোতে তৎকালীন সমাজ ও নিসর্গের ছবি পাওয়া যায়। বাঘা মসজিদের বা টাঙ্গাইলের আদিনা মসজিদের ফলকচিত্রের

বিষয়বস্তু ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশা। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক বিভিন্ন বিষয় ও আকৃতি নিয়ে টেরাকোটা তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন অফিস ও বাসাবাড়ির অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা ও ভবনের বাইরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এখন প্রচুর টেরাকোটা ব্যবহার করা হচ্ছে।

পাঠ : ৪

বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি কারুশিল্প

বাংলাদেশের নিত্যব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিস যেমন– দা, কুড়াল, খন্তা, কাঁচি, বাঁতি, লাঙলের ফলা, হাঁড়ি, পাতিল, কলসি, মটকা, তামা, কাঁসা-পিতলের অনেক জিনিস, নৌকা, রিকশা, খাট-পালঙ্ক, দরজা ইত্যাদিতে সৌন্দর্য আরোপের জন্য এসবের গায়ে আঁচড় কেটে, খোদাই করে, কখনোবা আলাদা করে লাগিয়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখি, বিভিন্ন জীবজন্তু ইত্যাদির ছবি বা নকশা আঁকা হয়। কারুকাজ করা এসব ব্যবহার্য সামগ্রীকে আমরা কারুশিল্প বলি। আমাদের দেশে বহু প্রকার কারুশিল্প আমরা ব্যবহার করি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারুশিল্প সম্পর্কে এখানে আমরা জানব।

রিকশা

রিকশা

বাংলাদেশের সুন্দর কারুশিল্প হিসেবে রিকশা দেশে ও বিদেশে খ্যাতি অর্জন করেছে। তিন চাকাবিশিষ্ট রিকশা চেহারা ও আকৃতির দিক থেকে একটি শিল্পকর্ম। তদুপরি বাঁশ, প্লাস্টিক ও কাপড় দিয়ে ফুল, পাতা, পাখির নকশা কেটে সেলাই করে রিকশাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। রিকশার হ্যান্ডেলের দুপাশে কখনও কখনও দুটি ফুলদানি স্থাপন করে তাতে প্লাস্টিকের ফুল লাগানো হয়। আবার হুডের চারপাশে রঙিন ঝুনঝুনি ঝুলিয়ে সাজানো হয়। এতে করে রিকশা চলার সময় ঝুনঝুনির ছন্দময় শব্দ হয়। প্রতিটি রিকশার সিটের পেছন দিকে সুন্দর ছবি এঁকে তা লাগিয়ে দেওয়া হয়। সবমিলিয়ে রিকশা একটি আকর্ষণীয় কারুশিল্প।

নৌকা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা অত্যন্ত পরিচিত একটি বাহন। এটি শুধু জলপথের নির্ভরযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত বাহনই নয় বরং আমাদের কারুশিল্পেরও উজ্জ্বল নিদর্শন। নৌকার চেহারা ও গড়নের দিক দিক থেকে যেমন শিল্পনৈপুণ্য

বিভিন্ন রকমের নৌকা

রয়েছে, এমনি কাঠ খোদাই করে নৌকার গায়ে অনেক কারুকাজ করা হয়। নৌকা তার চেহারার কারণে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন– গয়না, পানসি, বজরা, কোশা, সারজা, সাম্পান, দ্বীপ, জেলেনাও ইত্যাদি। অতীতে ময়ূরপঙ্খী, টিয়াঠোঁটি প্রভৃতি নামের নৌকা ছিল। গলুই ও অন্যান্য অংশের গড়ন ময়ূর, টিয়া ইত্যাদি পাখির অনুকরণে করা হতো। নৌকার গোলুইতে পিতলের দুটি চোখ, পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের পাত ইত্যাদি বসিয়ে নৌকা অলংকৃত করা হয়। পদ্ম, চাঁদ, তারা প্রভৃতি মোটিফ তার শোভা বর্ধন করে।

পাঠ : ৫

কাঠের বেড়া ও পালঙ্ক

কাঠের তৈরি বেড়া ও খাট–পালঙ্ক বাংলাদেশের অতি প্রাচীন কারুশিল্প। কাঠের বেড়াতে সুন্দর কারুকাজ করে তাতে সিংহ, হাতির মুখ, পদ্ম ইত্যাদি মোটিফের ব্যবহার করা হতো। কাঠের বেড়া একদা ফরিদপুর অঞ্চলের একটি জনপ্রিয় শিল্প ছিল। দরজার তোরণের দুপাশে লতা–পাতা মাঝখানে থাকে দুটি সিংহ। সিংহদ্বারের ঐতিহ্য থেকে এ রীতির প্রবর্তন হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। কাঠের বেড়ার মতো কাঠের পালঙ্কও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প। নানারকম কারুকার্যখচিত পালঙ্ক বা খাট বহু প্রাচীন কাল থেকে এদেশের ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতীতে পালঙ্কের পায়া বাঘ–সিংহের থাবার মতো করে খোদাই করা হতো। কখনোবা তা পরির মতো করে খোদাই করা হতো। জাতীয় জাদুঘরে রক্ষিত দুটি পালঙ্কের পায়া, মশারির স্ট্যান্ড পরিরা যেন ধারণ করে আছে। তাছাড়া আছে লতাপাতার বিচিত্র অলঙ্করণ। গ্রাম অঞ্চলে সচরাচর একজোড়া ময়ূর দিয়ে খাট–পালঙ্কের মাথার দিকের কাঠ অলঙ্কৃত করা হয়।

কাঠের তৈরি অলঙ্কৃত দরজা

প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের তৈরি কারুকার্য খচিত দরজা আমাদের কারুশিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। ফুল–লতা–পাতার নকশা ছাড়াও সিংহ, হাতি প্রভৃতি প্রাণীর মুখ খোদাই করে দরজা অলঙ্কৃত করা হতো। সুরম্য ভবনের বিশাল আকৃতির কারুকার্য খচিত দরজা ভবনের সৌন্দর্য দ্বিগুণ করে দিত। এখনো সৌখিন বাঙালিরা তাদের বাসগৃহে কারুকার্যময় দরজার ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের রুচিবোধের পরিচয় দেয়।

বাংলাদেশের অসংখ্য কারুশিল্প থেকে উপরে মাত্র কয়েকটি নিয়ে আলোচনা হলো। আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা লোকশিল্প ও কারুশিল্প সম্পর্কে আমরা আরও সচেতন হলে এ সকল বিষয়ে আরও জানতে পারব। বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলে এক এক লোকশিল্প ও কারুশিল্প শিল্পগুণের জন্য, নিপুণ কাজের জন্য ও সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। তোমরা যখন যে কারুশিল্প বা লোকশিল্প হাতের কাছে পাবে সেটি সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে জেনে নেবে।

পাঠ : ৬

বাংলাদেশে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার রয়েছে। যুগ যুগ ধরে এ সমস্ত শিল্প আমাদের জীবনে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্প ও কারুশিল্পের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোকশিল্পের ব্যবহার

বাংলাদেশের লোকশিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে মাটি, কাঠ ও কাপড়ের তৈরি নানারকম রঙিন খেলনা। এগুলো শিল্পমানের সাথে সাথে ছোটো শিশুদের খেলনা হিসেবেও খুব জনপ্রিয়। বিশেষ করে গ্রামগঞ্জের শিশুরা এসব মন ভোলানো খেলনা দিয়েই তাদের রঙিন শৈশব পার করে। আবার পাটের তৈরি শিকা, ফ্লোরম্যাট, টেবিলম্যাট ইত্যাদির ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। গ্রামেগঞ্জে ঘরে ঘরে এগুলো ব্যবহার করা হয়। লোকশিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও বহুল ব্যবহৃত উপাদানটি নকশিকাঁথা। মনোরম এই শিল্পটি শিল্পগুণ ও মানে যেমন সেরা তেমনি গ্রামগঞ্জে এমনকি শহরেও সমানভাবে এর ব্যবহার হয়। শীতে এ কাঁথার ব্যবহার হয় ঘরে ঘরে। এমনকি দেশের বাইরেও এর জনপ্রিয়তা ও চাহিদা আছে। অন্যদিকে লক্ষীসরা হিন্দুদের লক্ষীপূজার একটি প্রধান উপকরণ। তেমনি আলপনা, দেয়ালচিত্র ইত্যাদি বাঙালির উৎসব অনুষ্ঠানের অংশ হয়ে উঠেছে। বর্ষবরণ, পূজা, বিয়ে, জন্মদিন, গায়ে হলুদ, শহিদ দিবসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলপনা ও দেয়ালচিত্রের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়। এগুলো অনুষ্ঠানকে জাঁকজমকপূর্ণ ও রঙিন করে তোলে।

নকশিপিঠা বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের খুবই জনপ্রিয় একটি খাবার। শীতে এই পিঠা দিয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে আপ্যায়ন করা হয়। এসব নকশিপিঠা শুধু দেখতেই সুন্দর নয়, খেতেও সুস্বাদু। বাঙালির যে কোনো উৎসব, অনুষ্ঠান ও বিয়ে এই পিঠা ছাড়া হতো না। এখনো এই পিঠা বিয়ে ও সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রিয় খাবার।

অন্যদিকে নকশিপাখার ব্যবহার গরমের দিনে গ্রামের সাথে সাথে শহরেও দেখা যায়। মধ্যযুগে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলকচিত্র বিভিন্ন স্থাপনা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দেয়ালে স্থাপন করা হতো ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। বর্তমানে আধুনিক বিষয় ও প্রকৃতি নিয়ে প্রচুর টেরাকোটা করা হচ্ছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বাসাবাড়ি ইত্যাদিতে এ সমস্ত টেরাকোটার সৌখিন ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, লোকশিল্প শুধুমাত্র একটি শিল্পমাধ্যম নয় বরং এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের এই ঐতিহ্যবাহী ও গৌরবময় লোকশিল্পের সম্প্রসারণে আমরা অধিক যত্নবান হব। আমাদের জীবনকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করার জন্য লোকশিল্পের ভূমিকা ব্যাপক।

কাজ : খেলনা, গৃহসামগ্রী, উৎসবে যে সমস্ত লোকশিল্প ব্যবহৃত হয় সেগুলোর তিনটি করে তালিকা করো।

জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কারুশিল্পের ব্যবহার

লোকশিল্পের মতো কারুশিল্পও আমাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা জানি যে, ব্যবহারিক বিভিন্ন সামগ্রী বা বস্তুকে অলঙ্কৃত করা হলেই সেটা হয় কারুশিল্প। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, সমস্ত কারুশিল্পই আমাদের ব্যবহারিক কাজে লাগে। যেমন– বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈরি কারুকার্যময় বিভিন্ন আসবাব আমাদের গৃহের সৌন্দর্য যেমন বাড়ায়, তেমনি এগুলো আমাদের শোয়া, বসা, জামাকাপড় সংরক্ষণ, খাবার রাখা থেকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়। মাটির তৈরি কারুকার্যময় বিভিন্ন হাঁড়ি, পাতিল ও বাসনকোসন গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরসংসারের প্রধান উপকরণ। আবার তামা, কাঁসা ও পিতলের তৈরি বিভিন্ন নকশা করা তৈজসপত্রও আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি। সুন্দর অলঙ্কার ও শাড়ি বাংলাদেশের মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী। নকশা করা খাট, পালঙ্ক, দরজা, আলমারি এসব যেমন আমাদের সুরুচির পরিচয় দেয় তেমনি দৈনন্দিন জীবনে এসবের ব্যবহার অপরিহার্য। তাই বলা যায়, এসব শিল্প আমাদের জীবনযাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

কাজ : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার সামগ্রীতে যে কারুশিল্পের কাজ দেখি এমন দশটি সামগ্রীর নাম লেখো।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আলপনা' বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কী শিল্প?

ক. কারুশিল্প খ. লোকশিল্প

গ. কুটিরশিল্প ঘ. দারুশিল্প

২. চৌকপটের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে কোনটি?

ক. গাজীরপট খ. চক্ষুদানপট

গ. কালীঘাটেরপট ঘ. যীশুপট

৩. কোন অঞ্চলের নকশিকাঁথা শীর্ষস্থানীয়?

ক. রাজশাহী খ. ফরিদপুর

গ. যশোর ঘ. চট্টগ্রাম

৪. বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন পোড়ামাটির ফলকচিত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে কোথায়?

ক. বগুড়ার মহাস্থানগড়ে খ. কুমিল্লার ময়নামতিতে

গ. দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরে ঘ. রাজশাহীর বাঘা মসজিদে

৫. কাঠের তৈরি বেড়া ও খাটপালঙ্ক বাংলাদেশের অতি প্রাচীন–

ক. লোকশিল্প খ. হস্তশিল্প

গ. কুটিরশিল্প ঘ. কারুশিল্প

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. কারুশিল্প বলতে কী বোঝায়?

২. কাঠ দিয়ে তৈরি হয় এমন ৫টি কারুশিল্পের নাম লেখো।

৩. প্রতিদিন আমরা নানারকম কারুশিল্প ব্যবহার করি– সুনির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করো।

৪. কারুকাজখচিত আসবাবপত্র ও গয়না আমাদের অধিক পছন্দনীয় কেন?

৫. বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করে নকশিকাঁথা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৬. বাংলাদেশের জনপ্রিয় বাহন ও সুন্দর কারুশিল্প রিকশা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. কারুশিল্পের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবন একসূত্রে বাঁধা– কথাটি বিশ্লেষণ করো।

২. লোকশিল্পের ও কারুশিল্প ব্যবহারের বিষয়ে তোমরা কীভাবে পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবে?

৩. বাংলাদেশের উন্নয়নে চিত্রকলা কীভাবে ভূমিকা রেখেছে তা উল্লেখ করো।

৪. পটচিত্র কী? যা জেনেছ তা লেখো।

চতুর্থ অধ্যায়

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম

ছবি আঁকার বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে। পেনসিল, কালি-কলম, জলরং, তেলরং, প্যাস্টেল রং , অ্যাক্রেলিক রংসহ বিভিন্ন মাধ্যমে ছবি আঁকা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা ছবি আঁকার মাধ্যম- পোস্টার রং , অ্যাক্রেলিক রং ও জলরং সম্পর্কে জানব।

শিশুদের পোস্টার রঙে আঁকা ছবি

এ অধ্যায় পড়া শেষ করলে আমরা-

- পোস্টার রং এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারব।
- অ্যাক্রেলিক রং এবং তার ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে পারব।
- জলরং এবং তার প্রয়োগ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

পোস্টার রং

পোস্টার রং

ছবি আঁকার জন্য ছোটোদের কাছে প্রিয় একটি মাধ্যম হচ্ছে পোস্টার রং। এটি মূলত পানি মাধ্যমের রং (water baised)। এই রং পানি দিয়ে মিশিয়ে আঁকতে হয়। জল রঙের তুলনায় পোস্টার রং ভারী ও মোটা। একে অস্বচ্ছ রং বলা যায়। কারণ হলো, একটির উপর অন্য একটি রঙের প্রলেপ দিলে আগের রংটি সম্পূর্ণ ঢেকে যায়। আগের রঙের অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। পোস্টার রং বিভিন্ন শেডে বা নানা রঙে কাচের শিশিতে পাওয়া যায়। ঘন পেস্টের আকারে শিশিতে সংরক্ষিত থাকে। রং শিশি থেকে বের করে পানি দিয়ে পরিমাণমতো তরল করে কাগজে ব্যবহার করা হয়। পোস্টার রং দিয়ে সাধারণত কাগজেই ছবি আঁকা হয়। একটু খসখসে জমিনের কাগজে পোস্টার রং ব্যবহার করতে সুবিধা। ছবিতে উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে একাধিক তুলি এবং যথাসম্ভব পরিষ্কার পানি ব্যবহার করা উচিত। পোস্টার রং দিয়ে যে কোনো ধরনের ছবি আঁকা সম্ভব।

কাজ : পোস্টার রঙে একটি গ্রামীণ চিত্র আঁক।

পাঠ : ২

অ্যাক্রেলিক রং

অ্যাক্রেলিক রং টিউব আকারে ছাড়াও কাচের এবং প্লাস্টিকের কৌটায় ছোটো–বড়ো বিভিন্ন আকৃতিতে পাওয়া যায়। ঘন পেস্টের আকারে সংরক্ষিত এই রং পানি দিয়ে তরল করে ছবি আঁকা যায়। অ্যাক্রেলিক রং দিয়ে কাগজ, বোর্ড বা ক্যানভাস যে কোনোটিতেই ছবি আঁকা সম্ভব। এটিও মূলত অস্বচ্ছ রং। তবে পাতলা করে গুলিয়ে জল রঙের মতো ব্যবহার করা চলে। রং খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে তাড়াতাড়ি ছবি আঁকা যায়। ফলে শিল্পীদের কাছে এ সময়ে অ্যাক্রেলিক রং খুবই প্রিয় একটি মাধ্যম। অ্যাক্রেলিকে সব রং–ই পাওয়া যায়। বাজারে প্লাস্টিক রং নামে যে রং পাওয়া যায় সেটিও মূলত অ্যাক্রেলিক। তবে তা অ্যাক্রেলিক রং থেকে অপেক্ষাকৃত তরল। প্লাস্টিক রং পানি মিশিয়ে আঁকতে হয়।

অ্যাক্রেলিক রং

কাজ : জলরঙে ফুল বাগানের চিত্র আঁক।

পাঠ : ৩ ও ৪

জলরং

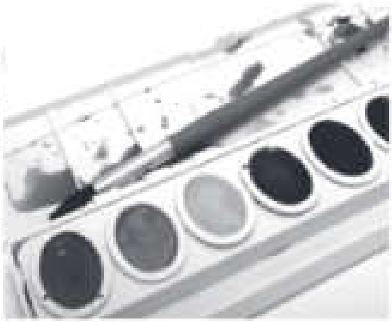
জলরং

জলরং এর নাম শুনলেই বোঝা যায়, তা জল মিশিয়ে আঁকতে হয়। জলরং বাক্সে ছোটো ছোটো খোপে চারকোনা ট্যাবলেটের মতো থাকে আলাদা আলাদা ট্যাবলেট অবস্থায়ও পাওয়া যায়। তবে টিউবের মধ্যে পেস্টের মতো অবস্থায়ও জলরং তৈরি হয়ে থাকে। জলরং ও পোস্টার রং কাছাকাছি হলেও গুণগত দিক থেকে অনেকটা ভিন্ন। জলরং স্বচ্ছ ও পাতলা। একটি রঙের ওপর আরেকটি রং দিয়ে আগের রংটি ঢেকে দেওয়া যায় না। স্বচ্ছ হওয়ার কারণে দুটো রং মিলে অন্য একটি রং হয়। জলরং সাধারণত কাগজের ওপর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জলরং ছবি আঁকার জন্যে একটু মোটা ও খসখসে জমিনের কাগজ সবচেয়ে উপযোগী। আমাদের দেশে যে মোটা কার্ট্রিজ পাওয়া যায় তাতে জলরঙে আঁকা যেতে পারে। যাদের পক্ষে সম্ভব তারা হ্যান্ডমেড কাগজ বা উন্নত ধরনের কাগজ জোগাড় করে নেবে।

জলরং ব্যবহারের নিয়ম

এক তা কার্ট্রিজ কাগজ অর্ধেক করে কেটে নাও। ইচ্ছে করলে আরও ছোটো করে নিতে পার। মনে রাখতে হবে কাগজ যেন দুমড়ে-মুচড়ে বা ভাঁজ হয়ে না থাকে। কাটাও যেন সুন্দর হয়। কাগজটিকে হার্ডবোর্ডের ওপর ক্লিপ দিয়ে এমনভাবে আটকাও যেন টান-টান থাকে। বোর্ডকে মেঝেতে বা কোনো উঁচু জিনিসে হেলান দিয়ে তোমাদের সামনে রাখ। একটা মগে পরিষ্কার পানি নাও। তার পাশে জলরঙে আঁকার জন্য বিশেষভাবে তৈরি প্যালেট অথবা কয়েকটি সাদা পিরিচ রাখ। সে সাথে রঙের টিউব বা রঙের কৌটাগুলি হাতের কাছে রাখ। এবার আঁকা শুরুর পালা। শুরু করার আগে খুব ভালো করে ভেবে নাও কী আঁকবে। ধরা যাক, সাদা কালো মেঘে ছাওয়া আকাশ আঁকবে। পেনসিলে হালকা দাগ দিয়ে মেঘের ড্রইং করে নাও। রাবার দিয়ে মোছামুছি না করলেই ভালো। বেশি ঘষলে কাগজের মসৃণতা নষ্ট হয়। রং লাগালে ঘষে দেওয়া স্থানে অপ্রয়োজনীয় দাগ দেখা দিতে পারে। ছবিও নষ্ট হতে পারে। রং লাগাবার আগে পরিষ্কার ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে অথবা চওড়া তুলি দিয়ে কাগজটিকে ভিজিয়ে নাও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। দেখবে কাগজের চুপচুপে পানি কিছুটা শুকিয়ে এসেছে। এবার পিরিচে রং নাও। কিছুটা বাদামি রংও নিতে হবে। পানির সাথে বাদামি, নীল রং তুলি দিয়ে গুলে নাও এবং চওড়া তুলি দিয়ে আধ-ভেজা কাগজে আলতো করে লাগাতে হবে। মনে রাখবে রং লাগানো শুরু করতে হবে কাগজের উপর থেকে। তুলি চালাতে হবে বাঁ দিক থেকে ডানে। পানির মতো রং নিচের দিকে গড়াবে। গড়ানো রংকে তাড়াতাড়িভাবে তুলি দিয়ে টেনে ওয়াশ শেষ করবে। এভাবে নীল রঙের ওয়াশ দেওয়ার সময় ড্রইং অনুযায়ী সাদা মেঘের অংশগুলো ছেড়ে যাবে। অর্থাৎ কাগজের সাদা যেন রয়ে যায়। এইভাবে নীলের

ওয়াশ শেষ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। রং কিছু শুকিয়ে এলে কালো মেঘের কাজ শুরু করবে। এজন্য নীল এবং কালো মিশিয়ে আবার কালো ও বাদামি মিশিয়ে দুটি পিরিচে আলাদা করে পরিমাণমতো রং তৈরি করে নাও। এরপর প্রথমে কিছুটা হালকা করে নীল এবং কালো মেশানো রং ড্রইং অনুযায়ী কালো মেঘের অংশে লাগাও। তারপর কালো এবং বাদামি মেশানো রঙ গাঢ় করে বেশি অন্ধকার বোঝাতে আগের রঙের উপরেই কিছু অংশে লাগাও। দেখবে ভেজা কাগজ এবং ভেজা রঙের ওপর এইভাবে রং লাগালে বৃষ্টির ভেজা ভেজা কালো মেঘের ধরনটা এসে যাবে। এবার সাদা মেঘে কালো আর বাদামি রংকে খুব হালকা করে মিশিয়ে যেখানে শেড প্রয়োজন সেখানে লাগাও। তোমাদের ছবিটি আঁকা এখানেই শেষ। এখানে একটি সহজ পদ্ধতির কথা বলা হলো। এই পদ্ধতিতে খুব কম সময়ের মধ্যে একটি জলরঙের ছবি আঁকা যাবে। তবে বিষয় অনুসারে অনেক ধরনের রং প্রয়োজন হবে। আলোছায়া অনুযায়ী রঙের তারতম্য হবে এবং সময়ও বেশি লাগবে। শ্রেণিতে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বারবার অনুশীলন করে জলরঙের ব্যবহার আয়ত্ত করতে হবে।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জলরং কোনটি?

ক. অস্বচ্ছ রং	খ. স্বচ্ছ রং
গ. ভারী রং	ঘ. তৈলাক্ত রং

২. কোনটি মিশিয়ে পোস্টার রং আঁকতে হয়?

ক. তেল	খ. তারপিন
গ. পানি	ঘ. গাম

৩. অ্যাক্রেলিক রং কীভাবে সংরক্ষিত থাকে?

ক. ঘন পেস্টের আকারে	খ. তরল কালির আকারে
গ. রঙিন কাঠির আকারে	ঘ. কেক আকারে

৪. অ্যাক্রেলিক রং শিল্পীদের কাছে প্রিয় কেন?

ক. রং খুব দ্রুত শুকিয়ে যায় বলে	খ. রং উজ্জ্বল হয় বলে
গ. রং মুছে যায় না বলে	ঘ. অল্প রং লাগে বলে

৫. জলরঙে ছবি আঁকা হয় কোনটিতে?

ক. ক্যানভাসে	খ. কাগজে
গ. হার্ডবোর্ডে	ঘ. কাঠের টুকরাতে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. নিচের রংগুলো থেকে শুধু কাগজে আঁকা যায় এমন রংগুলো আলাদা করো।
অ্যাক্রেলিক রং, প্লাস্টিক রং, জলরং, অক্সাইড রং, পোস্টার রং, টাইডাই, প্যাস্টেল রং, তেল রং।

২. পোস্টার রং সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।

৩. জলরং, ব্যবহারের নিয়মাবলি বর্ণনা করো।

৪. 'অ্যাক্রেলিক রং এখন শিল্পীদের প্রিয় একটি মাধ্যম'– কথাটির ব্যাখ্যা করো।

পঞ্চম অধ্যায়

ছবি আঁকার নানারকম আনন্দদায়ক অনুশীলন

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- সংখ্যা দিয়ে নানারকমের মজার মজার ছবি আঁকতে পারব।
- দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের আকার–আকৃতি, গঠন পরিমাপ করতে পারব।
- মাছ ও পাখির আকৃতি দিয়ে নকশা আঁকতে পারব।
- নিজে কল্পনা করে বিভিন্ন ধরনের নকশা আঁকতে পারব।

পাঠ : ১

যে সকল ছবি এঁকে আমরা আনন্দ পাব এখন সেসব মজার মজার ছবি তৈরি করতে শিখব। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা সাধারণ নিয়মের আলোকে ফুল, পাতা, নকশা ইত্যাদি শিখেছি। তোমরা নিজেরাই ইচ্ছেমতো ভালোলাগা ছবিগুলো আঁকবে। আমরা ছোটোবেলা থেকে গণিত বা অংক কষতে গিয়ে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ব্যবহার করে এসেছি। এখনও করছি এবং সারা জীবনই এ সংখ্যাগুলো আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে হবে। মজার ব্যাপার হলো এই সংখ্যাগুলো দিয়েও যে মজার ছবি তৈরি করা যায় তা কি ভেবেছি? এবার আমরা এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কিছু মজার মজার ছবি তৈরি করে নিজেরা যেমন আনন্দ পাব তেমনি বাবা, মা, আত্মীয়– স্বজন ও বন্ধুদেরও এঁকে দেখিয়ে অবাক করে দিব।

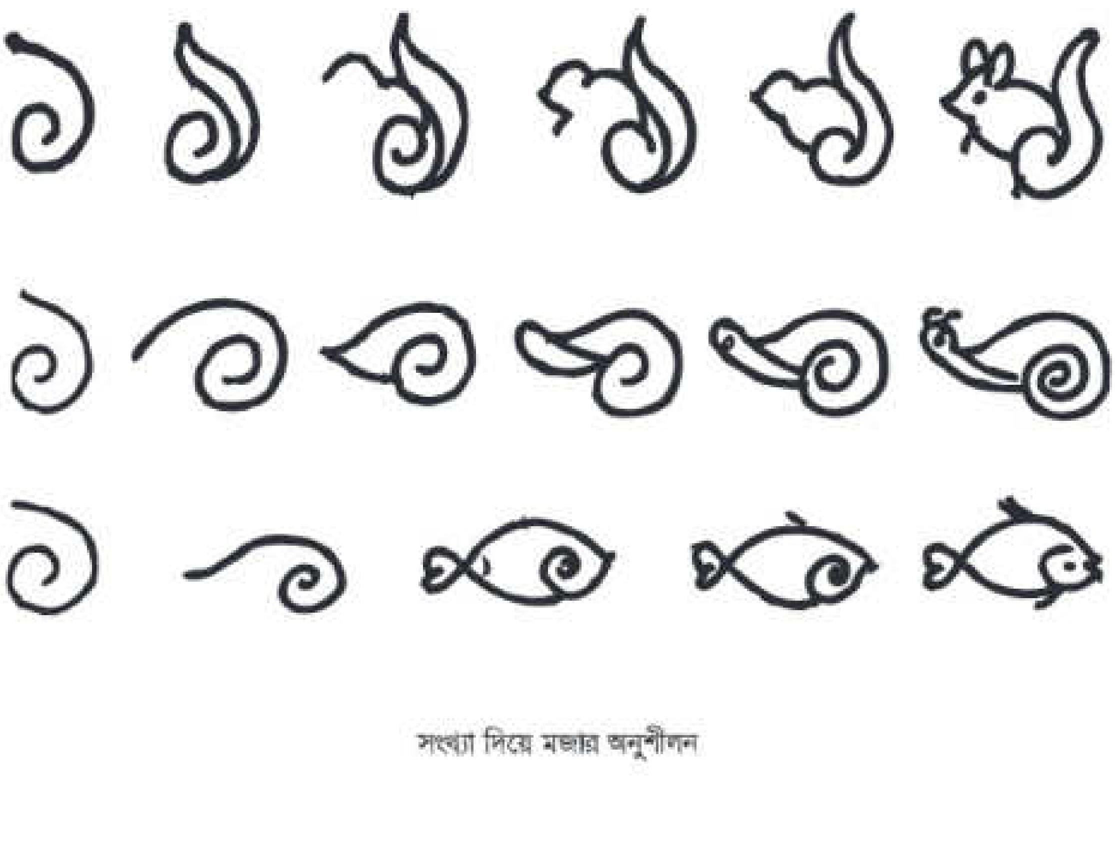

সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : সকলে ১ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ : ২

সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : সকলে ২, ৩ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ : ৩

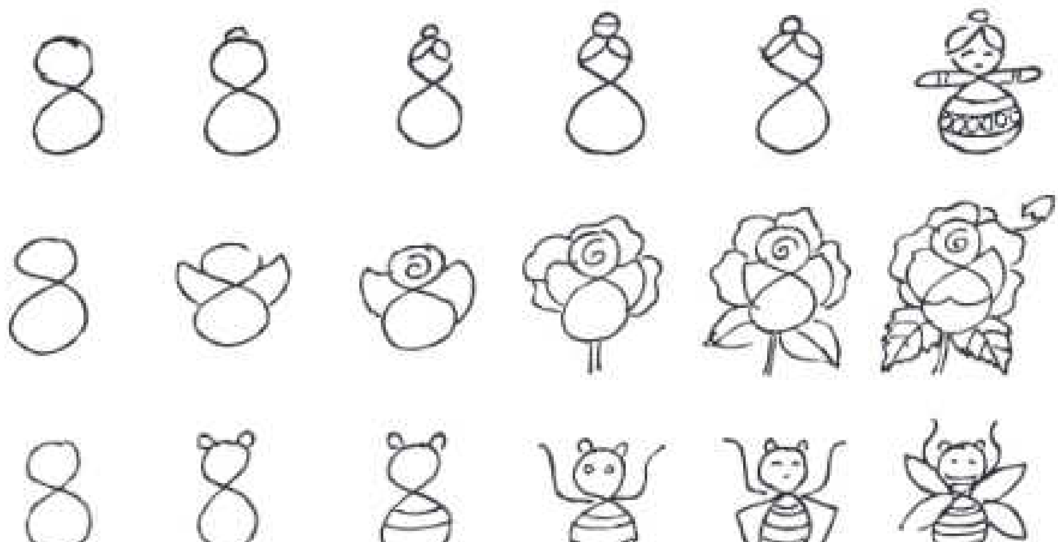

সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : সকলে ৪ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ : ৪

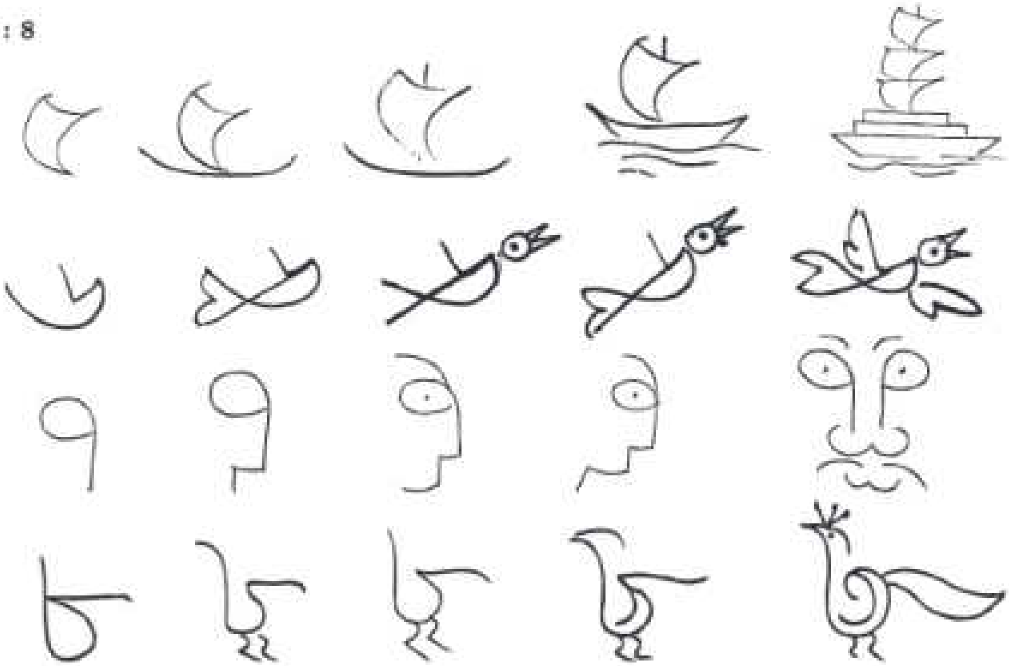

সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : ৫, ৬, ৭, ৮ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও।

পাঠ : ৫

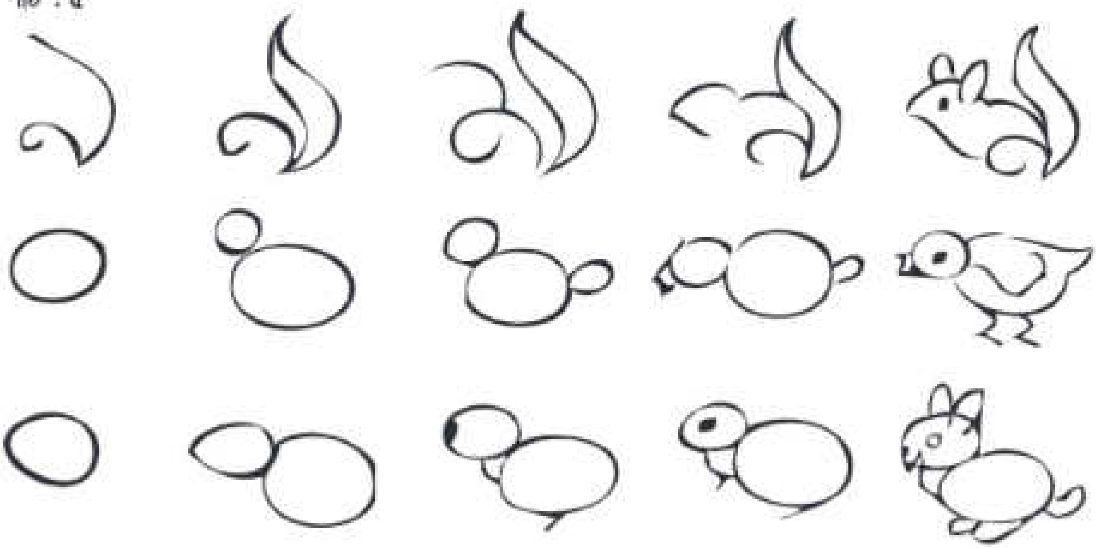

সংখ্যা দিয়ে মজার অনুশীলন

কাজ : সকলে ৯, ০ সংখ্যা দিয়ে তোমার নিজের মতো করে মজার অনুশীলন করে দেখাও।

ছবি আঁকার প্রাথমিক কিছু কথা

প্রতিদিন আমরা আমাদের চারপাশে যেসব জিনিস দেখি সেসব জিনিসের বাস্তবধর্মী ছবি আঁকার সময় তার আকারআকৃতির প্রতি খুবই সচেতন থাকতে হবে। কারণ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পূর্ব পাঠে আকারআকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে এসেছি।

পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার বেশিরভাগই বৃত্ত, চতুর্ভুজ কিংবা ত্রিভুজের মাঝে আবদ্ধ । বিশেষ করে বৃত্ত ও চতুর্ভুজের মাঝে সব কিছুকে একটা আকারে প্রাথমিকভাবে রূপদান করা যায়। বাস্তবধর্মী চিত্রাঙ্কনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– আকার যতই বড়ো কিংবা ছোটো হোক না কেন, আকৃতি ঠিক রাখতেই হবে।

যেমন–

সম আকার সম আকৃতি

সম আকার পৃথক আকৃতি

সম আকৃতি পৃথক আকার

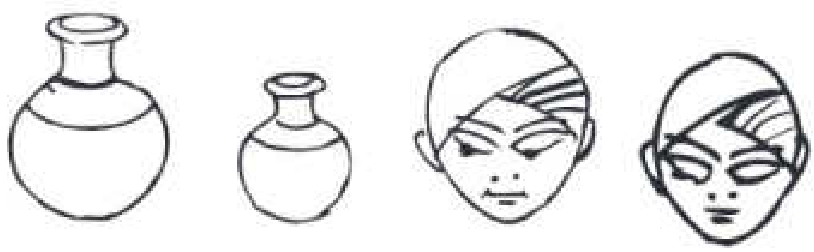

পৃথক আকার পৃথক আকৃতি

পূর্বেই বলেছি যে কোনো চিত্র অঙ্কন মানেই কতগুলো রেখার সমষ্টি, সেটা সরল, বাঁকা, বৃত্তাকার কিংবা যে কোনো ভাবেই হতে পারে। তাই অঙ্কনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রেখাই সমান গুরুত্ব বহন করে।

নানা ধরনের রেখার সমন্বয়ে কতগুলো অনুশীলন দেখানো হলো–

রেখার সমন্বয়ে অনুশীলন

এই সকল বিষয়সমূহ অঙ্কনের সময় যে বিষয়গুলো আমাদের মনে রাখতে হবে, তা হলো বিষয়বস্তু বা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, তার সুষমতা দেখার অনুপাত এবং তার যথার্থ স্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। এ সকল বিষয়সমূহ ঠিক রেখে আমরা যে কোনো বস্তু বা বিষয় অঙ্কন করি না কেন, তার একটা সুন্দর প্রকাশ অবশ্যই ফুটে উঠবে।

প্রকৃতি থেকে অনুশীলন

আমাদের চারদিকে আমরা যা কিছু দেখছি তার সবই প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আছে বর্ণিল রূপ। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতি ক্ষণে ক্ষণে এর রূপ পাল্টায়। সকালের নরম আলোয় প্রকৃতির যে রূপ, দুপুরের প্রখর আলোয় তা পাল্টে যায়। আবার সূর্যাস্তে সে রূপ হয় ভিন্ন অনুভবের–আর এ সব কিছুই ঘটে আলোছায়ার আবর্তনে। আবার ঋতুর বৈচিত্র্যতায়ও এর পরিবর্তন ঘটে নানারূপে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্তে নানা রূপে প্রকৃতি সাজে অপরূপ সৌন্দর্যে।

প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে আমরা সবাই ভালোবাসি। গ্রামবাংলার নানান দৃশ্য, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। দূরের সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত, নদীমাতৃক বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের প্রাণ ছুঁয়ে যায়। কখনোবা পরিপাটি শহরের রাস্তাঘাট, নীল আকাশ, নাগরিক সভ্যতা এই সবকিছু আমাদের মনে রেখাপাত করে। এইসব দৃশ্য অঙ্কনের পূর্বে তোমাকে গভীরভাবে বিষয়গুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ধর, তুমি কোথাও বেড়াতে গেলে– সেখানে শুধু মাঠের পর মাঠ, অনেক দূরে ছোটো ছোটো কুঁড়ে ঘর, আরও অনেক দূরে নদীতে কয়েকটি পালতোলা নৌকা, আকাশে কয়েকটি পাখি উড়ে যাচ্ছে, সামনের দিকে কয়েকটি তালগাছ। ছবিটি তোমার মনের মাঝে ধারণ করে নিয়ে এসে যখন বাসায় একটা ছোটো কাগজে আঁকতে বসবে, তখন পূর্বে যে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো জেনেছ, যেমন– আকার, আকৃতি, দূরত্ব, অনুপাত, আলোছায়া ইত্যাদির সংযোগে

২০১৫

এর সাথে তোমার মনের মাধুরী দিয়ে আঁকবে, ছবিটি তখন তোমার কাছে আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠবে। তাই কোনো কিছু আঁকার পূর্বে তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যত বেশি বাড়বে ছবিও তত বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

এসব বিষয় খেয়াল রেখে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে প্রকৃতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আঁকার অনুশীলন করবে।

নকশা

জ্যামিতিক ও প্রাকৃতিক আকৃতি দিয়ে নকশা

ষষ্ঠ শ্রেণিতে আমরা নানা আকার যেমন– ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদি দিয়ে নকশা অঙ্কনের কৌশল জেনেছি। আবার ফুল, লতাপাতা দিয়েও নানা প্রকারের নকশা অঙ্কনের অনুশীলন করেছি। এখন আমরা ওগুলোর সাথে আরও কিছু বিষয় যেমন পাখি, মাছের আকৃতি নিয়ে নিজেদের সৃজনশীল চিন্তা দিয়ে আরও সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকব। যে কোনো নকশা অঙ্কনের পূর্বে, নকশায় যে সকল বিষয় ব্যবহার করব তার আকার ও আকৃতিগুলো আলাদা করে এঁকে পরে তা একটি নির্দিষ্ট মাপের মাঝে সাজালে সুন্দর নকশা তৈরি হবে।

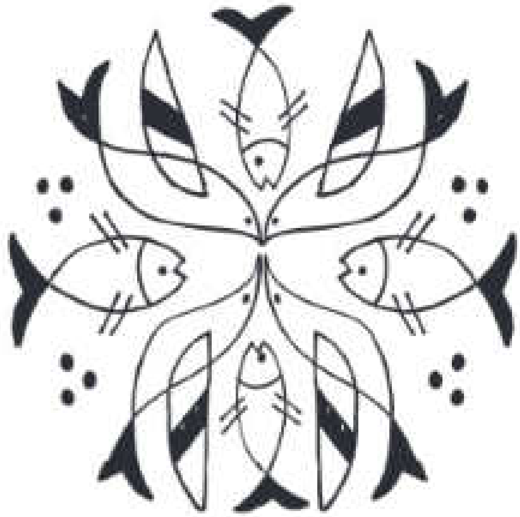

প্রাকৃতিক আকৃতি দিয়ে নকশা

জ্যামিতিক আকৃতি দিয়ে নকশা

নকশা হতে পারে বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে। যেমন– শাড়ির পাড়, কামিজ বা পাঞ্জাবির গলার নকশা, টেবিল ক্লথ বা কুশনের জন্য, ফুলদানি, নকশি পাতিল বা অন্য যে কোনো জিনিসকে শিল্পরূপ দেওয়ার জন্য নকশার প্রয়োজন হয়।

কাজ : মাছ ও পাখির আকৃতি ব্যবহার করে ৬"x ৬" মাপে তোমার মনের মতো একটা নকশা এঁকে দেখাও।

নমুনা প্রশ্ন

ব্যবহারিক

১. তোমার পছন্দমতো কোনো সংখ্যা দিয়ে মজার কোনো অনুশীলন করে দেখাও।

২. আকার–আকৃতির ভিন্নতা দেখিয়ে যেকোনো তিনটি বস্তু অঙ্কন করে দেখাও।

৩. তোমার প্রিয় ঋতুর একটি চিত্র পোস্টার রং অথবা জলরঙে আঁক।

৪. 2B এবং 4B পেনসিল ব্যবহার করে তোমার মনের মতো একটা পেনসিল স্কেচ করো।

৫. ৬"x৪" পরিমাপে মাছ ও পাখির আকৃতি ব্যবহার করে একটা নকশা আঁক।

৬. জ্যামিতিক আকৃতি (বৃত্ত, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ) ব্যবহার করে ৫" x ৫" মাপে একটি নকশা আঁক।

৭. প্রাকৃতিক আকৃতি ব্যবহার করে ৩" ব্যাসের একটি বৃত্তাকার নকশা আঁক।

৮. অক্ষর ব্যবহার করে একটি নকশা অঙ্কন করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকার শিল্পকর্ম

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- তুলা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সৌখিন খেলনা তৈরি করতে পারব।
- বিভিন্ন রঙের কুশন তৈরি করতে পারব।
- তুলা দিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য গেট বা ব্যানার লিখতে পারব।

সূচিশিল্প

- সুই–সুতা দিয়ে কাপড়ের উপর বিভিন্ন ফোঁড় তুলতে পারব।
- বিভিন্ন ফোঁড়ের নাম জানব ও বিভিন্ন নকশা তৈরি করতে পারব।
- কাপড় ও তুলা দিয়ে বিভিন্নরকম খেলনা তৈরি করতে পারব।

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

- ফেলনা জিনিস দিয়ে অনেক জিনিস তৈরি করতে পারব।
- এসব জিনিস দিয়ে নিজেদের ঘর সাজাতে পারব।
- ফেলনা জিনিসের শিল্পগুণ প্রকাশ করতে পারব।
- আলু ও ঢ্যাঁড়শ কেটে নকশা তৈরি করতে পারব।

পাঠ : ১

তুলা ও কাপড়ের তৈরি কারুশিল্প

তুলা দিয়ে সুন্দর একটি হাঁসের ছবি তৈরি করি। এছাড়া বিভিন্ন রঙের ফুল ও পাতা দিয়ে সাজানো ফুলদানির ছবি, পাখি, বিড়াল এবং অন্যান্য জিনিস তৈরি করি। কভারসহ একটি কুশন তৈরি করি।

উপকরণ

তুলা দিয়ে কারুকর্ম করতে গেলে মূল উপকরণ হলো তুলা তা তো বুঝতেই পারছ। ব্যান্ডেজ করার তুলা, সাধারণ পেঁজা তুলা, বিভিন্ন রং , বিভিন্ন রঙের কাপড়, পিচবোর্ড, বোর্ড কাগজ, সাদা কাগজ, কার্বন কাগজ, ময়দার আঠা, আইকা আঠা, কাঁচি, সুচ, সুতা ইত্যাদি। তবে দুরকম তুলা রয়েছে। লেখা ও কুশনের জন্য, লেপ তৈরি করার পেঁজা বা ধুনা তুলা আর ছবির জন্য স্তরে স্তরে সাজানো ব্যান্ডেজ করার তুলা । এছাড়া লাগবে– বিভিন্ন রঙের কাপড়, সাদা কাগজ, রঙিন কাগজ, পিচবোর্ড, পানিতে গোলানো রং, ময়দার ঘন আঠা, ধারালো কাঁচি, পেনসিল, কার্বন পেপার, চক, বিভিন্ন রঙের কাপড়, মোটা সাদা কাগজ অথবা বাদামি কাগজ ইত্যাদি।

পাঠ: ২

তুলা দিয়ে লেখা

এবার তুলা দিয়ে লেখার কাজ আরম্ভ করি। প্রয়োজনীয় মাপের রঙিন কাপড় নিই। লাল, নীল, সবুজ কিংবা বেগুনি যে রং আমাদের ভালো লাগে সেগুলো নিই । রং গাঢ় হতে হবে, হালকা রঙে ভালো দেখাবে না। পরিষ্কার পাকা মেঝে কিংবা টেবিলের উপর কাপড় বিছিয়ে যা লেখা হবে তা বড়ো বড়ো অক্ষরে চক দিয়ে লিখে নিই। পেঁজা তুলা দিয়ে ছোটো ছোটো বলের মতো গুটি তৈরি করি। হাতের তালুর উপর মাটি রেখে অন্য হাতের তালু দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেমন করে রুটি বেলার আটার বল তৈরি করা হয়, ঠিক তেমনি তুলার গুটি তৈরি করি। এবার কাপড়ের ওপর চকের লেখা বরাবর ময়দার ঘন আঠার লেই লাগিয়ে তুলার গুটিগুলো চাপ দিয়ে একটি একটি করে বসিয়ে যাই। গুটি বসাবার সময় একটি অপরটির গা ঘেঁষে বসাতে হবে। কাপড়ের মধ্যে একটি আধুলির মতো গোল করে গুটির ঠিক নিচে আঠা লাগাই।

গুটিগুলো সব সমান করে তৈরি করব। একই লেখায় ছোটো-বড়ো গুটি ব্যবহার করলে লেখা ভালো দেখাবে না। গুটির ব্যাস ২ বা ৩ সেমি. পর্যন্ত হতে পারে। মোটা লেখার জন্য বড়ো গুটি আর সরু লেখার জন্য ছোটো গুটি। ছবি দেখে আমরা সহজেই তুলা দিয়ে যেকোনো লেখা লিখতে পারব।

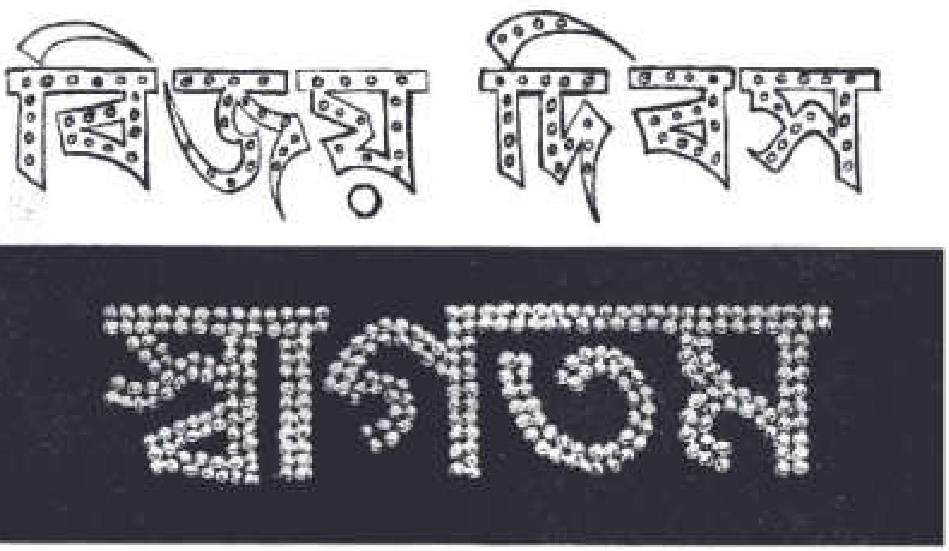

তুলা দিয়ে লেখা

পাঠ : ৩

তুলা দিয়ে ছবি

যে ছবিটি তৈরি করব তাতে সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, বেগুনি প্রভৃতি নানা রঙের ফুল থাকবে, আর থাকবে সবুজ পাতা ও ডাটা। থাকবে ফুলদানি, তাই নানা রঙের তুলার প্রয়োজন। পানিতে গোলানো যায় এ রকম পাউডার রং বাজারে পাওয়া যায়। যদি প্রয়োজনীয় সব ধরনের রং না পাওয়া যায় তাহলে এক রঙের সাথে অপর রং মিশিয়ে প্রয়োজনমতো রং তৈরি করে নিব। লাল ও হলুদ মিলিয়ে কমলা রং পাব, লাল ও নীল মিলিয়ে পাব বেগুনি রং। বাজারে যে সবুজ রং পাব তা গাছের পাতার সবুজ রং নয়। এই সবুজ রঙের সাথে সামান্য একটু লাল রং মিশিয়ে দিলে গাছের পাতার সবুজ রং হবে। ছবিতে যতগুলো রং ব্যবহার করব তার সব কয়টি রঙের তুলা আগেই রং করে শুকিয়ে রাখব।

তুলা দিয়ে যে ছবিটি তৈরি করব, এবার পেনসিল দিয়ে কাগজে তার ছবি আঁকি। তুলার ছবি যত বড়ো করব কাগজের ছবি ঠিক তত বড়ো করে আঁকব। ছবিতে বিভিন্ন রঙের ফুল থাকবে, তাই ফুলগুলো হবে বিভিন্ন জাতের ও ছোটো বড়ো বিভিন্ন আকারের। বিভিন্ন জাতের ফুলের পাতাও হবে বিভিন্ন আকার– আকৃতির। এসব বিষয় মনে রেখে ছবিটি আঁকি। কার্বন কাগজের কালি বিছিয়ে তার ওপর পেনসিল দিয়ে আঁকা ছবিটি বসাই। ক্লিপ বা আলপিন দিয়ে কাগজগুলো একসাথে আটকিয়ে নেই, যাতে নাড়াচাড়া করলেও সরে না যায়। এবার ছবির ওপর দিয়ে প্রত্যেকটি রেখা ধরে পেনসিল চালিয়ে ছবিটি এঁকে নিব। কার্বন কাগজের ওপর বিছানো কাগজে উল্টো হয়ে ছবির ছাপ পড়ে গেছে। এ রকম আরও দু–তিনটি উল্টো ছবির ছাপ দিব। পেনসিলে আঁকা ছবিটিতে রং দিয়ে ঠিক করে নেব তুলার তৈরি ছবিতে কোন ফুলের কী রং হবে? ফুলদানির রং কী হবে? পাতার রং কেমন হবে?

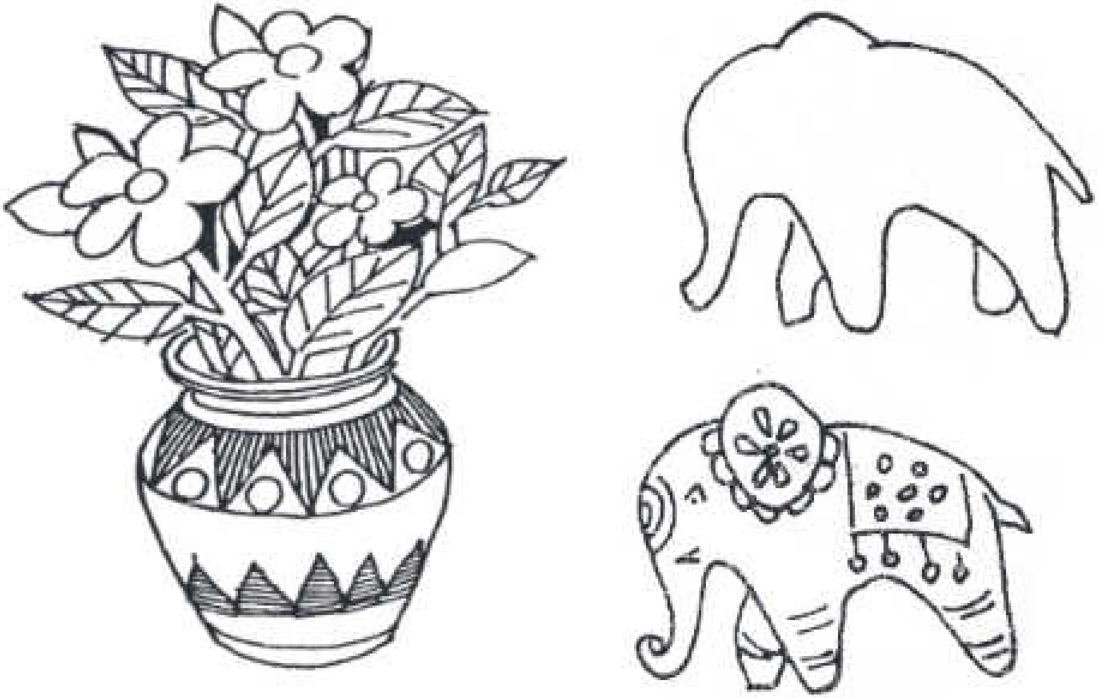

তুলা দিয়ে ছবি

আলাদা আলাদাভাবে কেটে রাখা এক এক ভাগ কাগজ নিই। ছবির ছাপের উল্টো পিঠে ময়দার আঠা লাগিয়ে নির্দিষ্ট রঙের তুলা প্রায় ১ সেমি. পুরু করে বসিয়ে চাপ দিই, যাতে ভালো করে লেগে যায়।

কাগজের সব কয়টি টুকরো এভাবে তুলা লাগিয়ে একটু শুকিয়ে নিই। ছবির চারপাশে বেশকিছু জায়গা থাকবে। এমনি মাপের এক টুকরো শক্ত পিচবোর্ড এবং পিচবোর্ডের চাইতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৫ সেমি. করে বড়ো এক টুকরো কালো রঙের ভালো কাপড় নিই। কাপড় ভালো করে ইস্ত্রি করা প্রয়োজন, যাতে কুঁচকানো না থাকে। কাপড়ের ওপর পিচবোর্ড বসিয়ে চার কিনারায় ভালো করে আঠা লাগিয়ে চারপাশের বাড়তি কাগজ ভাঁজ করে বোর্ডের সাথে সেঁটে দিই। খেয়াল রাখব বোর্ডের ওপর কাপড় যেন টান হয়ে থাকে, কোথাও যেন ঢিলা না হয়। এবার তুলা লাগানো কাগজগুলো কার্বন কাগজের ছাপ বরাবর ধারালো কাঁচি দিয়ে কেটে তুলার ফুল, পাতা, ডাঁটা, ফুলদানি ইত্যাদি তৈরি করব।

কাগজে আঁকা রঙিন ছবি দেখে তুলার ফুলদানি, ফুল, পাতা, ইত্যাদি পিচবোর্ড লাগানো কালো কাপড়ের ওপর ছবির মতো সাজাই। ঠিকভাবে সাজানো হলে এক এক অংশ তুলে পেছনের কাগজে ভালো করে আঠা লাগাই এবং আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে চাপ দিয়ে কাপড়ের সাথে সেঁটে দিই। খেয়াল রাখব ছবির অংশগুলো চারদিকে যেন কাপড়ের সাথে ভালো করে লাগে, কোথাও যেন উঠে না থাকে। এবার দেখি, বিভিন্ন রঙের তুলা দিয়ে তৈরি ছবিটি বেশ সুন্দর লাগছে। ফুল ও পাতাগুলো আসল ফুল ও পাতার মতো নরম নরম মনে হচ্ছে! আমরা চেষ্টা করলে এই নিয়মে আমাদের খুশিমতো সুন্দর সুন্দর ছবি তৈরি করতে পারব। ফুলের ভেতর কেশর দিতে

চাইলে পাপড়িগুলো আলাদা-আলাদাভাবে কেটে মাঝখানে অন্য রঙের তুলার কেশর বসিয়ে চারদিকে পাপড়িগুলো বসিয়ে দিতে হবে। শুধু ফুল-পাতার ছবি নয়, এই নিয়মে বিভিন্ন রঙের জামা-কাপড় পরিয়ে মানুষের ছবি, পশু, পাখি, গাছপালা প্রভৃতির ছবি তৈরি করতে পারি। তুলা দিয়ে করা ছবি কাচ দিয়ে ফ্রেম করে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখলে খুবই সুন্দর দেখাবে।

পাঠ : ৪ ও ৫

সূচিশিল্প

আমরা বাড়িতে মাকে সেলাই করতে দেখি। আমাদের জন্য জামা-কাপড়, জামার ওপর সুন্দর নকশা ইত্যাদি অনেক সূচিশিল্প তাঁরা করেন। সুঁই, সুতার নানারকম কাজ আমরা নিজেরাও করি। যেমন-বোতাম লাগানো, ছেঁড়া কাপড় জোড়া দেয়া, সেওয়া, ছোটোখাটো রুমাল, টেবিলের কাপড় ইত্যাদি। গ্রামে ও শহরে অনেক বাড়িতেই আমরা কাঁথা ব্যবহার করি। কিছু আছে সাধারণ কাঁথা আবার কিছু আছে নকশিকাঁথা। কাঁথায় অনেক রঙের সুতা দিয়ে সেলাই ও নকশা থাকে। দেখতেও খুব চমৎকার । কাঁথায় পাখি, মাছ, ফুল, লতাপাতা, হাতি, ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি অনেক কিছুই রঙিন সুতায় সেলাই করে ছবি ও নকশা আকারে তুলে ধরা হয়। আবার অনেকে ছোটো ছোটো নকশিকাঁথা ছবির মতো বাঁধাই করে ঘরে সাজিয়ে রাখে। এই যে শিল্প, একে আমরা বলি সূচিশিল্প। এই শিল্প চারুশিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। বহুকাল ধরে নানি-দাদিরা নানারকম নকশা করা পাখা, তোয়ালে, জায়নামাজ, কাঁথা ইত্যাদি সেলাই করতেন। অবসর সময় তাঁরা অনেকদিন ধরে এক একটি কাঁথা তৈরি করতেন। সুই, সুতা দিয়ে নিজেদের সুখ-দুঃখের কাহিনি নকশা করে ফুটিয়ে তুলতেন। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে সাধারণ পরিবারের মহিলারা এখনো নানারকম নকশিকাঁথা তৈরি করছেন। এই নকশিকাঁথার পরিচিতি ও খ্যাতি লোকশিল্প হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র। বাংলাদেশের বিভিন্ন জাদুঘরে ও পৃথিবীর অন্যান্য সংগ্রহশালায় বাংলাদেশের এই লোকশিল্পের সংগ্রহ রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এই শিল্পের বেশ প্রচলন হয়েছে। নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়েও বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে এর কদর বেড়েছে। এই ধরনের লোকশিল্প রপ্তানি করে আমাদের দেশে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে। সুঁচিশিল্প সাধারণত গ্রামের মেয়েরাই বেশি করে থাকে। এই শিল্প আমাদের সৌন্দর্যবোধের মান উন্নয়ন করে এবং প্রয়োজনও মেটাতে সাহায্য করে। সুঁই, সুতার কাজ করা রুমাল, টেবিলের কাপড়, শাড়ি, কামিজ, ওড়না, প্যান্ট, ছোটো শিশুদের ফ্রক, পর্দা ইত্যাদি দেখতে খুবই সুন্দর। আমরা নিজেরাও এ ধরনের জামা-কাপড় পরতে খুব পছন্দ করি। তাই এই শিল্প শিখে নিজ নিজ প্রয়োজন মিটিয়ে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারব। সেলাই ফোঁড়ের কাজের প্রধান বিষয় হলো নানা ধরনের ফোঁড় ও নানা রঙের সুতার যথাযথ ব্যবহার।

উপকরণ

সরু ও মোটা নানা ধরনের সুই। সাদা ও রঙিন সুতা বা উল। কাপড়ে দাগ দেওয়ার জন্য পেনসিল। প্রয়োজনমতো কাপড় অথবা চট। একটি ছোটো কাঁচি। একটি ফ্রেম (সুঁই-সুতায় সেলাই করার জন্য)। উপকরণ রাখার জন্য একটি বাক্স বা কৌটা। কাপড়ে মাপ দেওয়ার জন্য স্কেল বা মাপ দেওয়ার ফিতা। উপকরণ তো হলো!

২০১৫

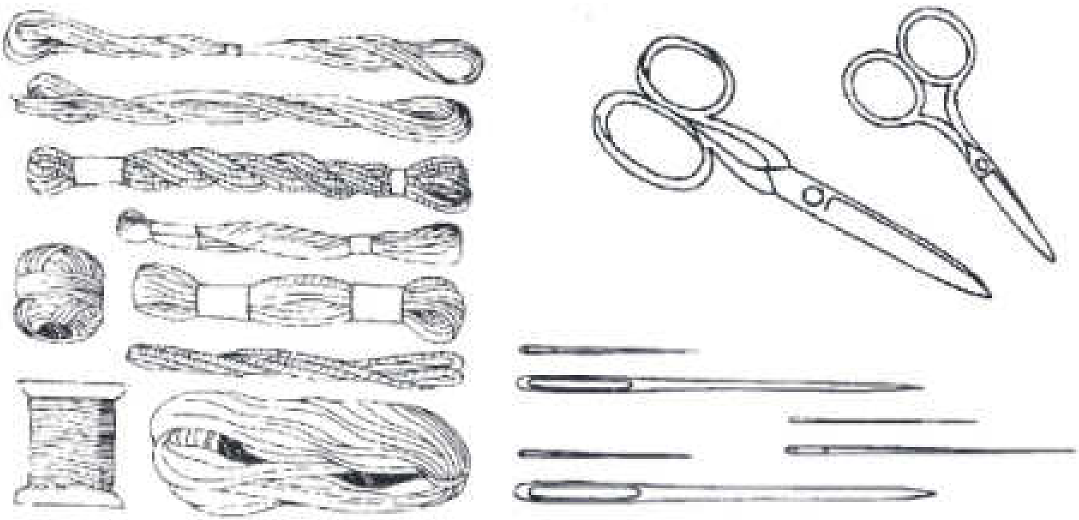

উপকরণ

এবার কাপড় বা চটে সুই, সুতা দিয়ে সেলাই করে নকশা করতে হলে আমাদের নানা ধরনের ফোঁড় জানা দরকার। সূচিশিল্প বা এমব্রয়ডারি কাজে অনেক ধরনের ফোঁড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখানে কয়েকটি ফোঁড় ও এগুলো কীভাবে করতে হয়, ফোঁড়গুলোর চেহারা কেমন তা বুঝতে পারব ও ফোঁড়গুলো তুলতে পারব।

ফোঁড়গুলোর নাম

১। রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই

২। হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই

৩। বখেয়া ফোঁড়

৪। স্টেম ফোঁড়

৫। চেইন ফোঁড়

৬। লেজি–ডেইজি ফোঁড়

৭। ক্রস ফোঁড়

৮। তারা ফোঁড়

৯। বোতাম ঘর ফোঁড়

১০। কম্বল ফোঁড়

১১। সার্টিন ফোঁড়

১২। হেরিংবোন ফোঁড়।

রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই

বিভিন্ন ফোঁড়ের মধ্যে রানিং ফোঁড় বা রান সেলাই সবচেয়ে সহজ। যে কাপড়ের ওপরে সেলাই করব সেটিকে বাঁ হাত দিয়ে একটু উঁচু করে ধরে ডান হাতে সুঁই নিয়ে সেলাই করব। কাপড় বাঁ হাতের ওপরে রেখে বুড়ো আঙুল দিয়ে অবশিষ্ট চারটি আঙ্গুলের উপর কাপড়খানাকে চেপে ধরি, ডান হাতে সুই ধরে, একবারে ৩ থেকে ৪টি ফোঁড় করা যাবে। তবে প্রতিবারই ৩–৪টি ফোঁড় দেবার পর, সুতা টেনে সেলাইটি শক্ত করে নেব। রানিং ফোঁড় শেখার জন্য সাদা কাপড় হলে রঙিন সুতা, রঙিন কাপড় হলে সাদা সুতা ব্যবহার করব। কারণ এতে সেলাই সোজা ও সমান হচ্ছে কিনা তা সহজেই বুঝতে পারব। এই ফোঁড় দিয়ে যেমন রেখা সেলাই করা যায়, তেমনি ভরাট সেলাইও করা যায়। নকশিকাঁথায় রানিং ফোঁড় বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়।

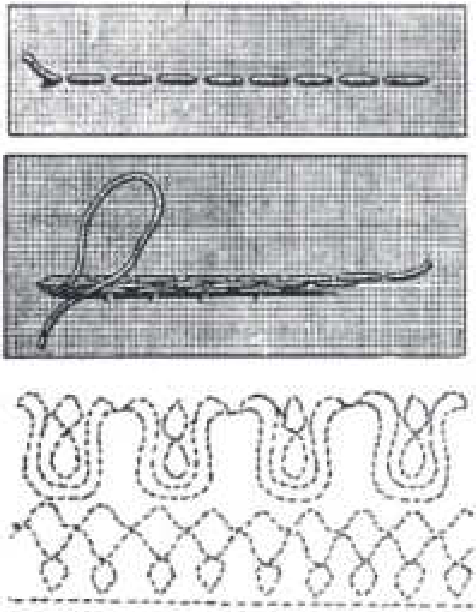

রান ফোঁড় ও নকশা

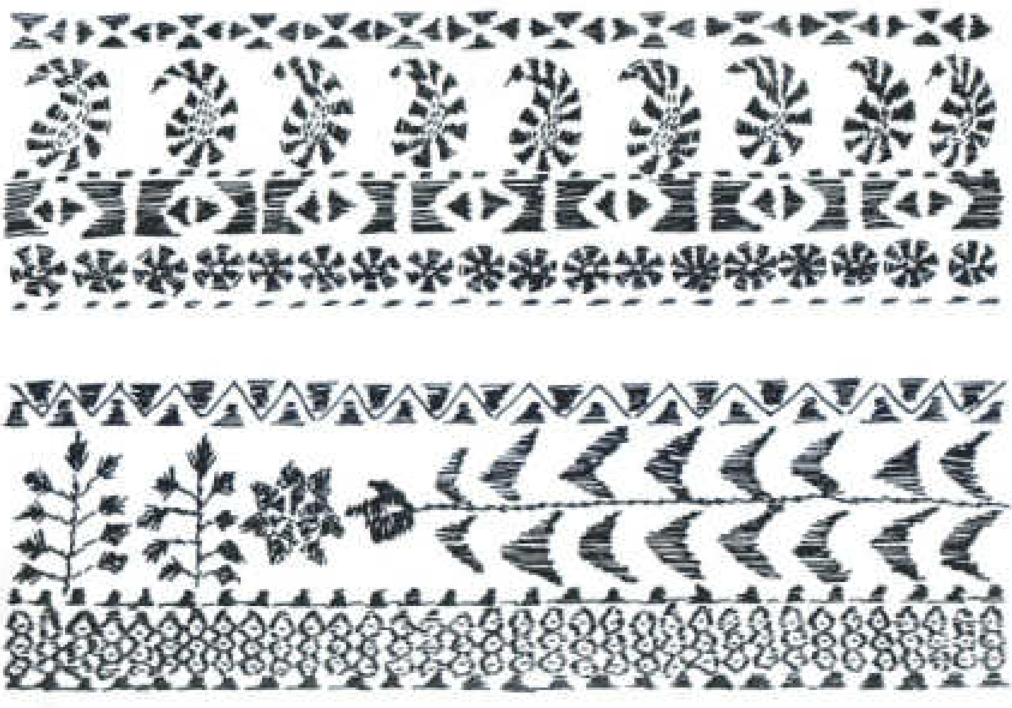

রান ফোঁড়, রান ফোঁড়ের ভরাট ও রান ফোঁড়ের নকশা

রান ফোঁড় দিয়ে নকশিকাঁথার জায়নামাজ

হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই

টেবিলের কাপড়, রুমাল, জামা ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি যে কোনোটির কিনারা মুড়ে সেলাই করার জন্য এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। টেবিলের কাপড়, রুমাল, জামা ইত্যাদি কাপড়ে তৈরি যে কোনোটির কিনারা মুড়ি সেলাই করবার জন্য যে ফোঁড় ব্যবহার করা হয় তাকে হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই বলে। এই সেলাই করার সময় কাপড়ের কিনারা এমনভাবে ভাঁজ করে নেব, যাতে কিনারার সুতাগুলো বেরিয়ে না পড়ে। এই ফোঁড় দিয়ে কুশন, জামা, শাড়ি, টেবিলের কাপড় ইত্যাদিতে অ্যাপ্লিক নিয়মে নকশা করা যায়। অ্যাপ্লিক হলো রঙিন কাপড় কেটে অন্য কাপড়ের ওপর বসিয়ে নকশা করা। হেম বা মুড়ি সেলাই শিখে নিলে আমরা অ্যাপ্লিক পদ্ধতিতে নানা রকম কাজ করতে পারব।

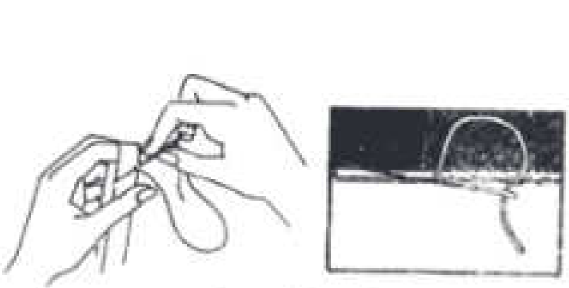

হেম ফোঁড় বা মুড়ি সেলাই

হেম ফোঁড় দিয়ে অ্যাপ্লিক কাজ

বখেয়া ফোঁড়

বখেয়া ফোঁড় সোজা দিকে মেশিনের সেলাই–এর মতো দেখতে হয়। এই ফোঁড় তুলতে হলে, রানিং ফোঁড়ের মতো নিচ থেকে ওপরে সুই চালিয়ে ফোঁড় তুলতে হয়। পরে সামান্য একটু সামনে আবার ওপরে সুই দিয়ে ফোঁড় তুলে আনি। সুই এর মুখটি আবার আগের ফোঁড়ের কাছে ফিরিয়ে আনি। পুনরায় ওপর থেকে নিচে ফোঁড় তুলি। এভাবে বার বার ফোঁড় দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই। দেখব মেশিনের সেলাইয়ের মতো সেলাই হয়েছে। এই ফোঁড় সাধারণত জামা–কাপড়ের জোড়া লাগাতে প্রয়োজন হয়। বখেয়া ফোঁড়ের জোড়া খুব শক্ত হয়। তাছাড়া এই ফোঁড় দিয়ে নানা রকম নকশাও করা যায়। যেমন–২৫ সেমি. চওড়া ও ২৫ সেমি. লম্বা কাপড়ে প্রথমে পেনসিলে একটি মাছের ছবি এঁকে রেখা অনুযায়ী বখেয়া ফোঁড় তুলে মাছের ছবিটি ফুটিয়ে তুলতে পারি। অন্যান্য যেকোনো নকশাও বখেয়া ফোঁড় দিয়ে করতে পারব।

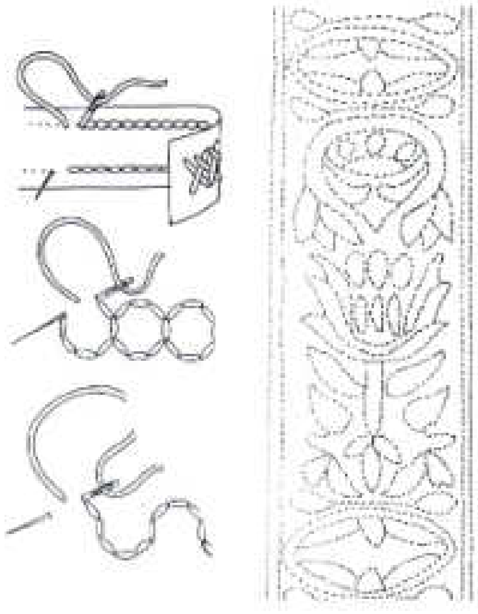

বখেয়া ফোঁড় ও বখেয়া ফোঁড়ের নকশা

পাঠ : ৬

স্টেম ফোঁড় বা ডাল ফোঁড়

ডাল ফোঁড় সাধারণত গাছের ডাল, ফুল ও পাতার ডাল, লতা ইত্যাদি নকশা সেলাই করবার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এই ফোঁড় দিয়ে রেখার আকারে সেলাই করে গেলে, রেখাটি দড়ির মতো প্যাঁচানো প্যাঁচানো দেখা যায়।

ডাল ফোঁড় দিয়ে সেলাই করবার সময় ফোঁড়গুলো পর পর সামনে থেকে পেছনের দিকে আসবে। সুচে সুতা পরিয়ে সুতার মাথায় গিঁট দিই। সুচের মাথা কাপড়ের নিচ দিক দিয়ে ওপরে তুলি। সুচের মাথা যেখানে উঠল তার থেকে সামান্য পেছনে বাঁ দিকে একটু সরিয়ে, সুঁই ঢুকিয়ে, ফোঁড় দুটির মাঝামাঝি জায়গায়, ডান

স্টেম ফোঁড় বা ডাল ফোঁড়

দিকে একটু সরিয়ে সুচের মাথা উঠাই। এবার সুচের মাথা যেখানে উঠল তার পেছনে বাঁ দিকে একটু সরিয়ে আবার সুচের মাথা ঢোকাই এবং শেষ দুই ফোঁড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটু ডানে সরিয়ে সুচের মাথা ওঠাই। এভাবে একের পর এক ফোঁড় দিয়ে সামনে থেকে পেছনের দিকে আসতে থাকি। দেখি সেলাই কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!

নকশাটি ডাল ফোঁড় দিয়ে করি

পাঠ : ৭

চেইন ফোঁড়

এই ফোঁড় দেখতে অনেকটা শেকলের মতো। চেইন ফোঁড়ের জন্যে অপেক্ষাকৃত একটু মোটা সুতা নিই। সুতার শেষ মাথায় শক্ত করে গিঁট দিই। অথবা শক্ত করে একটি ফোঁড় তুলি। সুই, –সুতা টেনে ওপরে তুলি। এবার সুচের মাথায় ডান হাত বাঁয়ে সুতা ঘুরিয়ে একটি ফোঁড় তুলি। দেখব ফোঁড়টি একটি বেড়ির মতো হয়েছে (হাত ঘুরাবার সময় সুতা কিছুটা ঢিলে রাখবে)। সুচটিকে এবার আগের ফোঁড়ের পাশ দিয়ে ঢুকিয়ে নিচ থেকে ওপরে তুলি। ফোঁড় তোলার সময় সুচ, সুতার ওপর সবসময় রাখতে হবে। সুতা আবার ডান থেকে বাঁয়ে ঘুরিয়ে ফোঁড় তুলি। এভাবে ফোঁড়ের পাশ দিয়ে সুই ঢুকিয়ে নিচ থেকে ওপরে সুতা আনি।

চেইন ফোঁড় দিয়ে যেকোনো পোশাকে নকশা করা যায়। বিশেষ করে জামা, শাড়ি, রুমাল, টেবিলের কাপড় ইত্যাদিতে ফুল, লতাপাতা করা যায় । তরাট কাজেও এই ফোঁড় ব্যবহার করতে পারব। চিত্রকলায় বৈচিত্র্য আনতে এই সেলাই ব্যবহার করতে পারব।

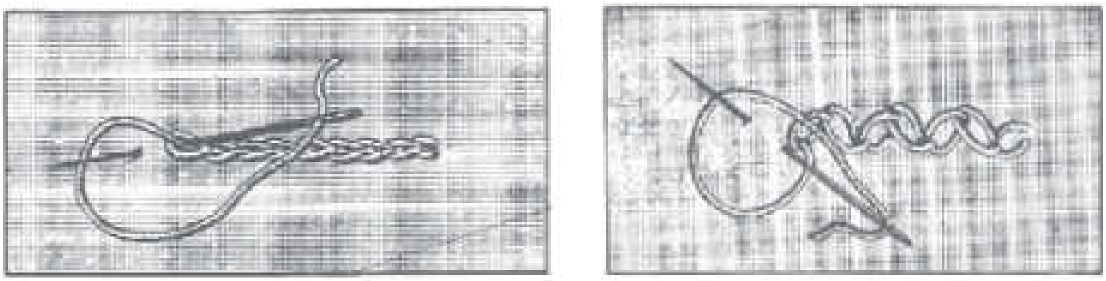

চেইন ফোঁড়

লেজি–ডেইজি ফোঁড়

লেজি–ডেইজি ফোঁড় চেইন ফোঁড়ের মতোই করতে হয়। তবে চেইন সেলাইয়ে ফোঁড়গুলো লাইন ধরে সামনে এগিয়ে যায় এবং এ ফোঁড়গুলোর আলাদা আলাদা এক–একটি চেইন ফোঁড় থাকে। রুমাল,ছোটোদের জামা–কাপড় বা যেকোনো পোশাক–পরিচ্ছদ থোকা থোকা ফুল, নকশা, লতা, পাতা ইত্যাদি এই ফোঁড় দিয়ে করলে চমৎকার দেখায়।

এবার রুমালে ফুল লতা-পাতার নকশা এঁকে তাতে লেজি-ডেইজি ফোঁড় তুলে নকশাটি ফুটিয়ে তুলি। বিভিন্ন রকমের ফোঁড় শেখা হলো। এবার একটি রুমাল ও টেবিলের কাপড় তৈরি করার চেষ্টা করি। রুমাল প্রত্যেকেরই প্রয়োজন। আমরা স্কুলে বা অন্য কোথাও বের হবার সময় সাথে একটি রুমাল রাখি। তাহলে প্রথমেই একটি রুমাল তৈরি করা শিখি। রুমাল সেলাই শিখে নিজে ব্যবহার করতে পারব। অন্যদেরও উপহার দিতে পারব।

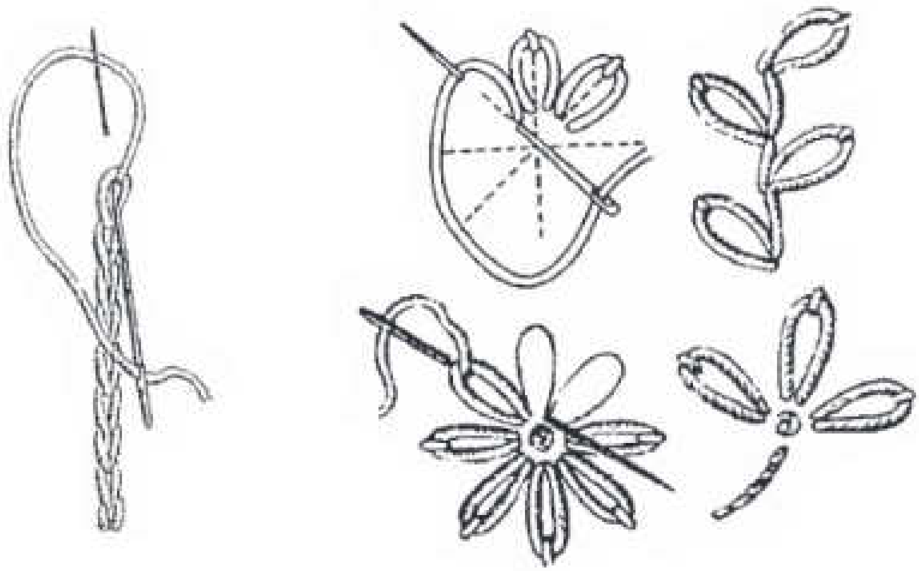

লেজি-ডেইজি ফোঁড়

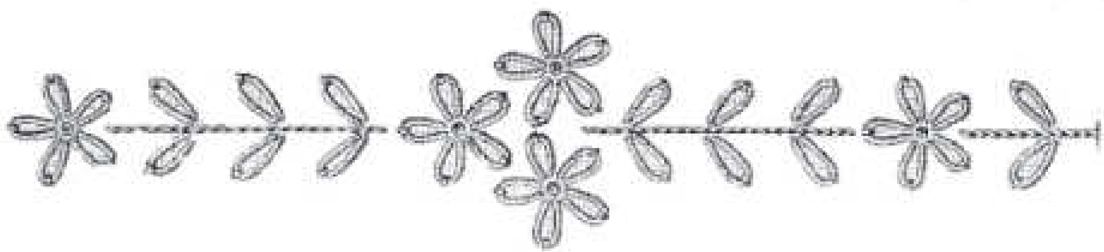

লেজি-ডেইজি ফোঁড়ের নকশা

পাঠ : ৮

ক্রস ফোঁড়

এই ফোঁড় অনেকটা ক্রস বা গুণ চিহ্নের মতো। ক্রস ফোঁড়ের জন্য সাধারণত নেট কিংবা সেলুলা কাপড় ব্যবহার করা হয়। সেলুলা কাপড়ের জমি ঘর ঘর করা ছকের মতো। চটের ওপরও এই ফোঁড় সুন্দরভাবে করা হয়।

ক্রস ফোঁড় দিয়ে জ্যাকেটের নকশা

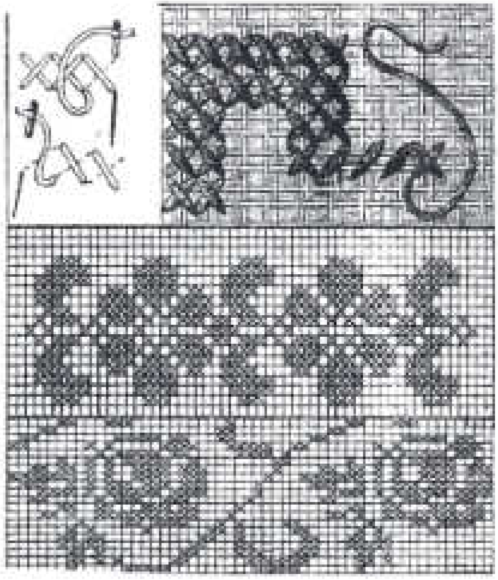

গ্রাফ বা ছক কাগজে আঁকা নকশাটি ঘর গুনে গুনে করি

তারা ফোঁড়

তারা ফোঁড় হলো অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মতো। ছবি দেখে অনায়াসে এই ফোঁড় তুলতে পারব। এই ফোঁড় সাধারণত চেক কাপড় বা চটে করা সহজ।

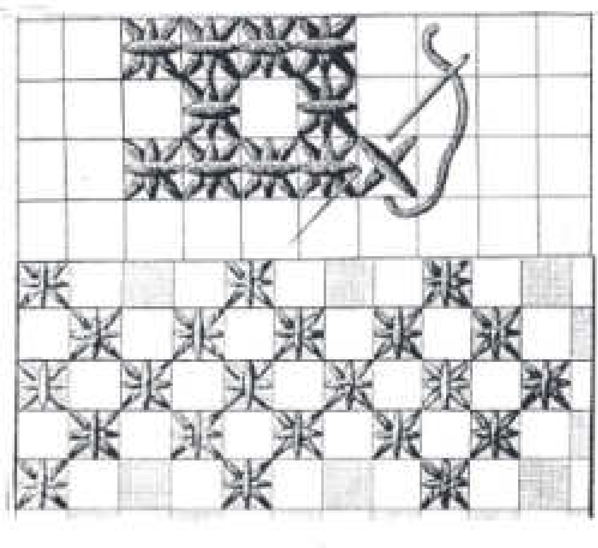

তারা ফোঁড়

পাঠ : ৯

বোতাম ঘর ফোঁড়

জামা কাপড়ে বোতাম ঘর কাটার পর কাটা অংশ থেকে যাতে সুতা বেরিয়ে না আসতে পারে সেজন্য সেলাই করে বোতাম-ঘরের মুখ বেঁধে দেওয়া হয়। বিশেষ ধরনের যে ফোঁড় দিয়ে এই সেলাই করা হয় তাকে বলে বোতাম ফোঁড়।

(ছবি দেখে করি)

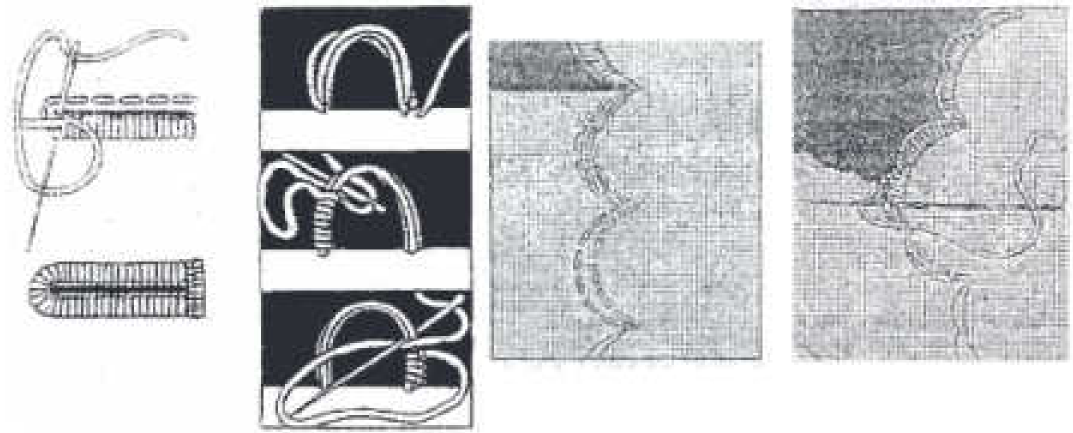

বোতাম ঘর ফোঁড়

বোতাম ঘর ফোঁড় দিয়ে কাটওয়ার্ক

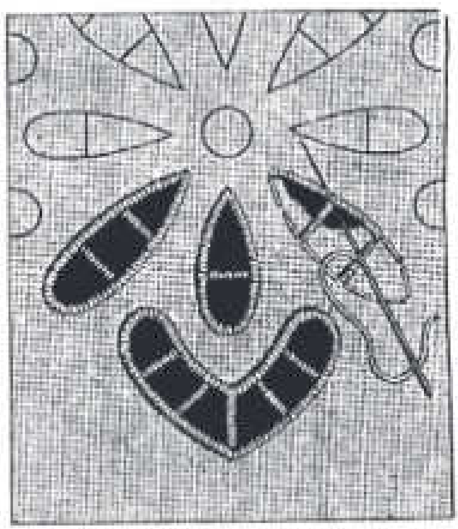

পাঠ: ১০

কম্বল ফোঁড়

গায়ের শাল, কম্বল ইত্যাদির প্রান্ত সেলাই করার জন্য এই ফোঁড় ব্যবহার করা হয়। কম্বল ফোঁড় খুবই সহজ। অনেকটা বোতাম ঘর ফোঁড়ের মতো।

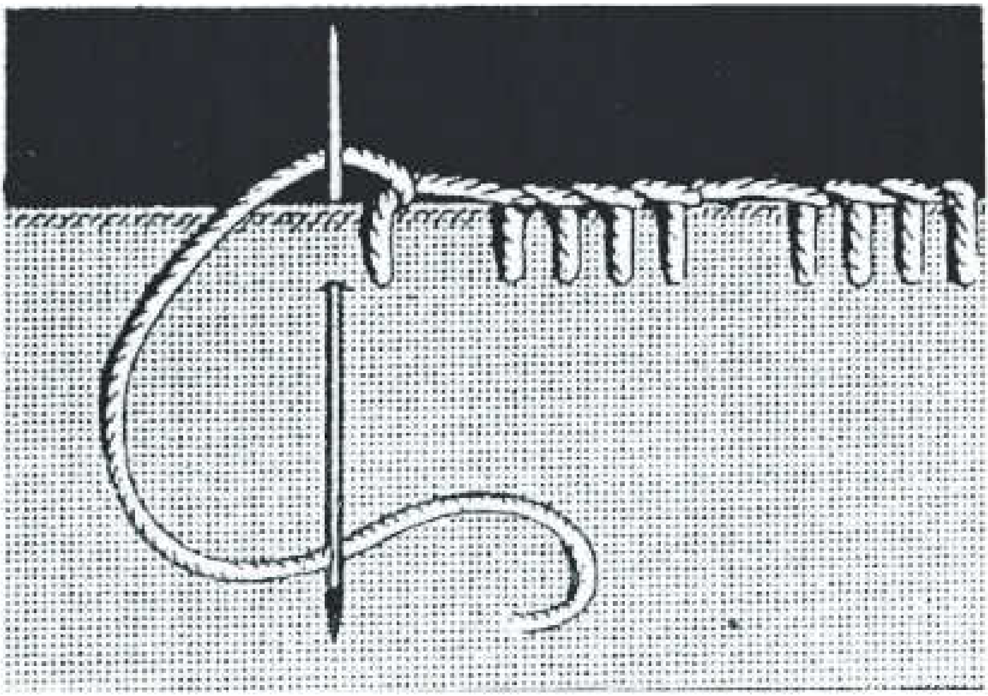

কম্বল ফোঁড়

সার্টিন ফোঁড়

সার্টিন ফোঁড়ও বেশ সহজ। ছবি দেখেই আশা করি আমরা করতে পারব। এই ফোঁড় পাশাপাশি তুলতে হয়।

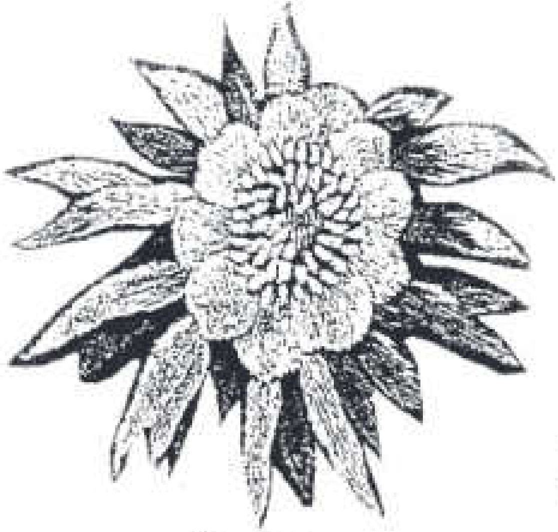

সার্টিন ফোঁড় দিয়ে ফুল–পাতা

সার্টিন ফোঁড় দিয়ে নকশা

হেরিংবোন ফোঁড়

এই ফোঁড় অনেকটা ক্রস ফোঁড়ের মতো। ক্রস ফোঁড় যেভাবে করতে হয়, এই ফোঁড়ও অনেকটা সেভাবেই করব। ছবি দেখে আশা করি সহজেই ফোঁড়টি আমরা বুঝতে পারব।

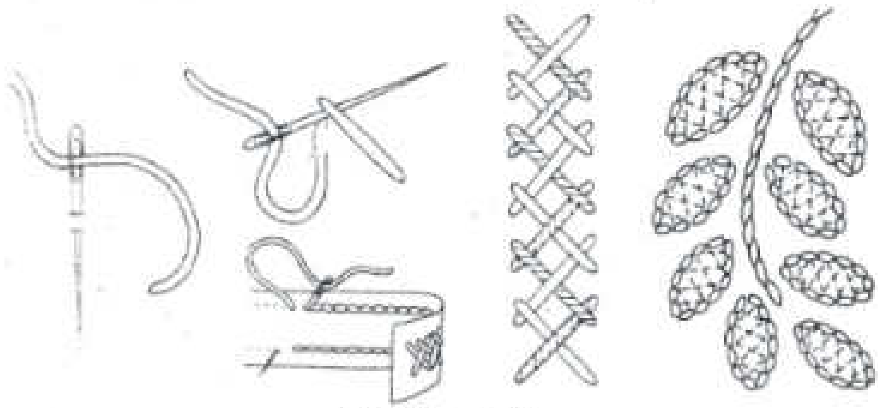

হেরিং ফোঁড় ও নকশা

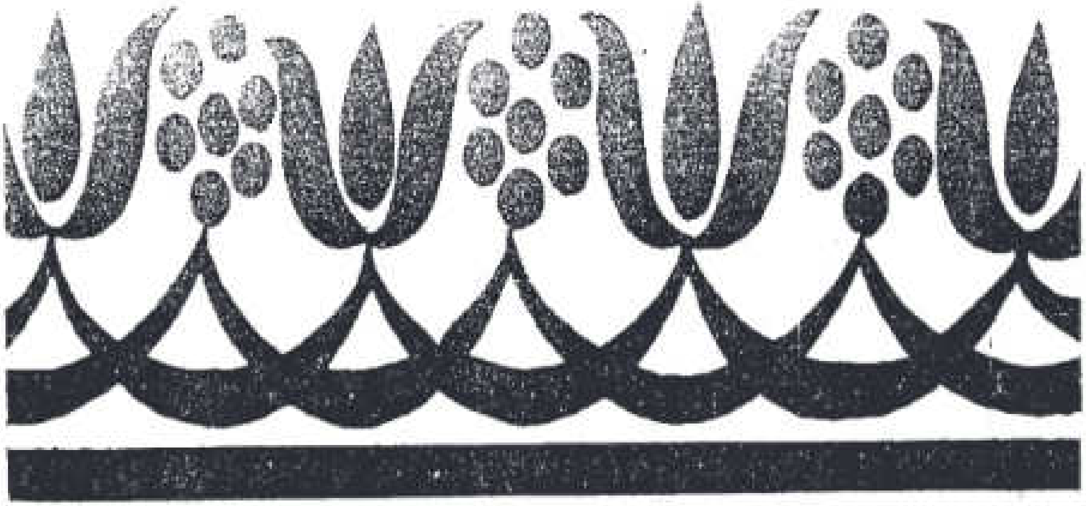

নকশাটি হেরিংবোন ফোঁড় দিয়ে অনুশীলন করি

ফেলনা জিনিস দিয়ে শিল্পকর্ম

কোনো কাজে লাগবে না ভেবে জিনিস আমরা ফেলে দিই, সেগুলোকেই বলি ফেলনা জিনিস। একটু চিন্তা করে নিজের কল্পনাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব ফেলনা জিনিস দিয়েও আমরা অনেক সুন্দর-সুন্দর শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারি। প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় এমন অনেক জিনিসই আমাদের আশপাশে ছড়িয়ে আছে যা সাধারণভাবে আমাদের চোখে ফেলনা। আমরা খুব একটা খেয়াল করি না, তেমন নজরে পড়ে না এমন সব জিনিস দিয়েও অনেক সুন্দর-সুন্দর জিনিস তৈরি করা যায়। সুন্দর কিছু তৈরি করার প্রবল ইচ্ছা ও কল্পনা শক্তি এ দুটিকে কাজে লাগালেই আমরা গাছের শুকানো ডালপালা, পাটকাঠি, কাঠের টুকরা ইত্যাদি ফেলনা জিনিসকে রূপে-রসে ভরে দিয়ে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করতে পারি। এমনি দু-একটি শিল্পকর্মের কথা জেনে নিই।

শুকনো ডালে কাগজের ফুল

বরই গাছের ছোটো একটা কাঁটাওয়ালা ডাল নিই। অন্য কোনো গাছের ডাল নিলেও চলবে, তবে তাতে কাঁটা থাকতে হবে। সাদা কিংবা হালকা হলুদ রঙের ঘুড়ির কাগজ নিয়ে ২.৫০ সিমি. চওড়া ফালি করি। কাগজের ফালি তিন চার ভাঁজ করে ২.৫৪ সেমি. চওড়া ও ১৫ সেমি. লম্বা করি। এবার কাঁচি দিয়ে কাগজের

ফালির একপাশ চিকন–চিকন করে কাটি, অপর পাশে মোটামুটিভাবে ৬ সেমি. মতো জায়গা আগাগোড়া জোড়ানো থাকবে, যেন কাটা না হয়। এভাবে কাটা কাগজের ফালিটি কিছুটা চিরুনির মতো মনে হবে। কাগজের ফালি কাটা হয়ে গেলে ভাঁজ খুলে নিই।

পাটকাঠির মাথার সরু অংশ বেছে কয়েক টুকরো পাটকাঠি নিই। ধারালো ছুরি বা পুরানো ব্লেড দিয়ে এক টুকরো পাটকাঠির এক মাথা সমান করে কাটি। এবার চিরুনির মতো কাটা কাগজের ফালির জোড়ানো পাশে ময়দার আঠা লাগিয়ে পাটকাঠি সমান করে কাটা মাথার ৩৫ সেমি. পরিমাণ জায়গায় কাগজের জোড়ানো অংশের মাথা বসিয়ে পেঁচিয়ে যাই। এক পেঁচের ওপর অন্য পেঁচ পড়বে। এভাবে পাঁচ–ছয় পেঁচ দেওয়ার পর কাগজের ফালি ছিঁড়ে আলাদা করে নিই। এবার ধারালো ছুরি বা ব্লেড দিয়ে কাগজের পেঁচ ঘেঁষে কাগজ সমেত পাটকাঠির মাথাটি কেটে নিই। এবার পাটকাঠির টুকরোয় পেঁচানো কাটা কাগজের সরু মাথাগুলো চারদিকে সমান করে ছড়িয়ে দিই। কী সুন্দর ফুল হয়ে গেল!

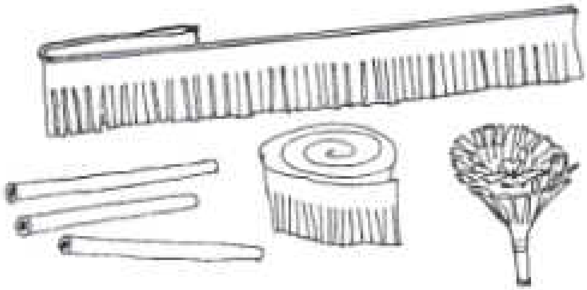

এভাবে একই পাটকাঠির মাথায় বার বার চিরুনির মতো কাটা কাগজ পেঁচিয়ে কেটে নিয়ে একটির পর একটি ফুল তৈরি করতে পারি। এক টুকরো পাটকাঠি শেষ হয়ে গেলে আরেক টুকরো নেব। প্রয়োজনীয় পরিমাণে ফুল তৈরি হয়ে গেলে শুকনো ডালের এক একটি কাঁটায় এক একটি ফুল গেঁথে বসিয়ে দিই। ডালের কাঁটার চেয়ে ফুলের নিচের পাটকাঠির টুকরো অনেক নরম, তাই গাঁথতে কষ্ট হবে না। সমস্ত ডালটি ফুলে ফুলে ভরে দিই। কত সুন্দর লাগছে। ছোটো একটা ফুলের টবে মাটির মধ্যে ফুলের ডালটি পুঁতে একটা মানানসই জায়গায় রাখি। দূর থেকে দেখি সবাই যখন আসল ফুল বলে ভুল করবে তখন আমাদের কেমন আনন্দ হবে।

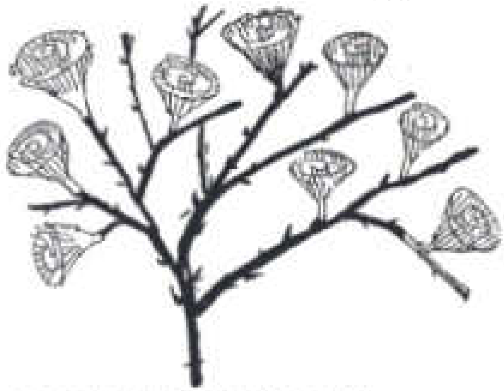

শুকনো ডালে ফেলনা কাগজের ফুল

মোজাইক ছবি

৮–১১ ইঞ্চি কাপড় ও আইকা আঠা নিই। কাপড়ের ওপর একটি পাখি আঁকি। এরপর বিভিন্ন রঙের কাগজ লাগিয়ে কাপড়ের ফুলের ওপর একটার পর একটা ঠিকভাবে সাবধানে লাগাই। পাখির বাইরে অন্য রঙের টুকরো লাগাতে হবে। দুদিন এভাবে রেখে দিই। পরে ফ্রেম করে ঘরে টানাতে পারব। এটি তৈরি করতে খুব আনন্দ পাব।

এভাবে ইচ্ছে করলে রঙিন কাগজ দিয়েও একইভাবে যেকোনো ফুল, হাতি বা যেকোনো মোজাইক ছবি তৈরি করতে পারব।

মোজাইক ছবি

আলু ও ট্যাড়শ কেটে রঙে ডুবিয়ে ছাপচিত্র

আলু, ট্যাড়শ অথবা করলা কেটে যেকোনো রং দিয়ে ছাপ দেওয়া যায় (বৃত্তের নমুনা অনুসারে)। আলু, ট্যাড়শ ও করলা অথবা ছাপ দেওয়া যায় এ ধরনের যেকোনো তরকারি কেটে এবং সেটি দিয়ে কাগজে রঙের ছাপ দিয়ে সুন্দর নকশা তৈরি করা যায়। এছাড়াও বিভিন্ন নতুন ধরনের জিনিস দিয়ে ছাপ দিলে সুন্দর–সুন্দর প্যাটার্ন তৈরি করা যায়।

প্রয়োজনীয় তথ্য

পানি দিয়ে গোলানো যে কোনো রং এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। এই ছবিতে আলু জাতীয় কোনো নরম বস্তু প্রথমে মসৃণ করে টুকরো কেটে নিয়ে তারই একাংশে গর্ত করে খুদে নিয়ে কীভাবে ছাপানোর উপযোগী সাময়িক ব্লক করে নিতে হবে তা দেখানো হয়েছে। ঐ খোদাইকৃত অংশে রং লাগিয়ে তা দিয়ে নির্দিষ্ট কাগজে বা কাপড়ে ছাপ মারলেই চমৎকার নকশার সৃষ্টি হবে।

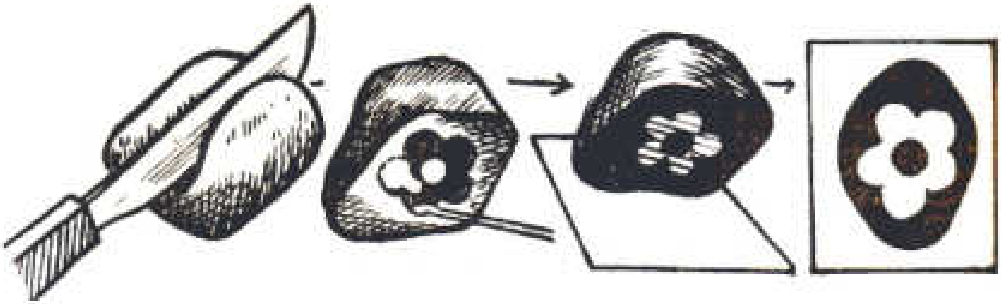

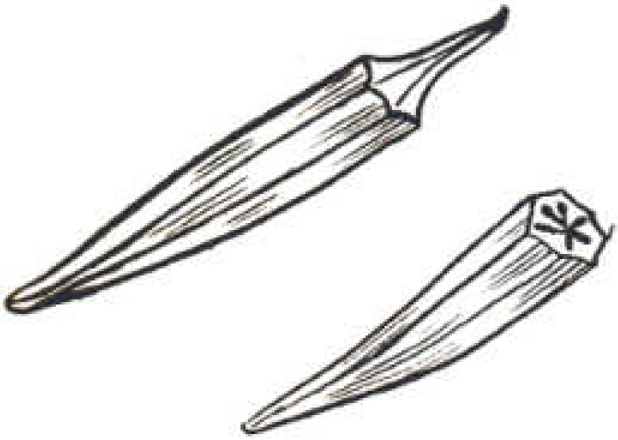

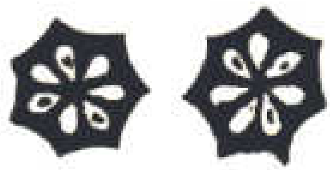

আলু ঢ্যাঁড়শ কেটে ছাপ দিয়ে নকশা

ফেলনা কাগজের মুখোশ তৈরি

ফেলে দেয়া অনেকগুলো কাগজ জোগাড় করি। কাগজগুলো ১ দিন পানিতে ভিজিয়ে রাখি। আটার লেই তৈরি করি (জ্বাল দিয়ে)। এবার কাগজ পানি থেকে চিপড়িয়ে তুলে নিই। আটার লেইয়ের সাথে কাগজের জিনিসগুলো মিশিয়ে নিই।

এতে মণ্ড তৈরি হবে। মণ্ডের সাথে একটু তুঁত মিশিয়ে নিতে হবে। তা না হলে পোকায় কেটে ফেলবে।

অনেকগুলো শুকনো কাগজ, দড়ি বা সুতলি দিয়ে গোল করে মাঝারি বলের আকার তৈরি করি। এবার বলের উপরের দিকে মাটির মতো কাগজের মণ্ড দিয়ে যেকোনো বিড়াল বা মানুষের মুখের আকৃতি করি। দুই–তিন দিন শুকাতে দিই। শুকিয়ে গেলে নিচ থেকে কাগজের বলটি বের করে ফেলি। মানুষ বা বিড়ালের মুখোশ তৈরি হয়ে গেল। এবার রং করি। (ছবি দেখে করতে পারব)

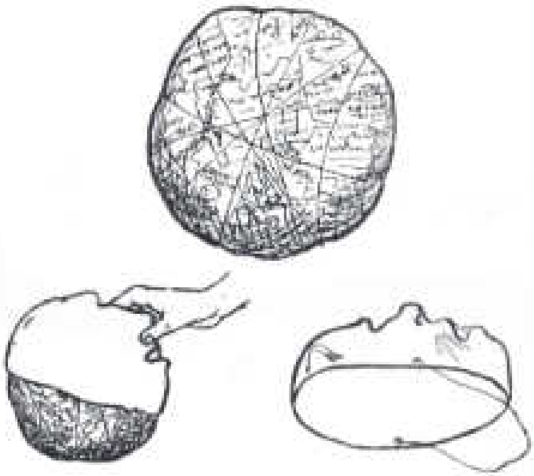

ফেলনা কাগজের মণ্ডের মুখোশ তৈরি

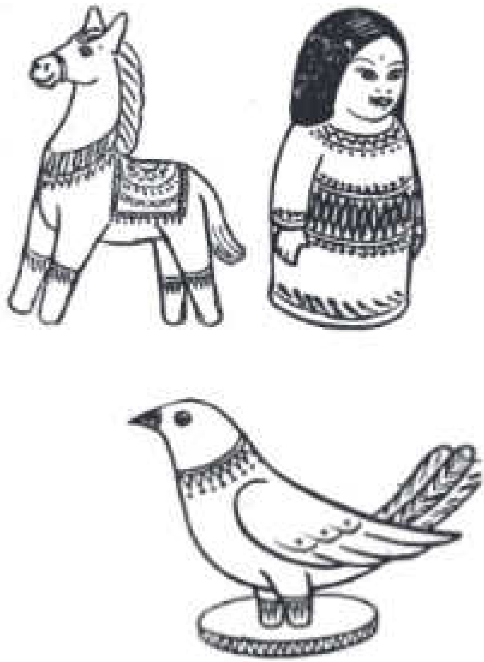

মাটি দিয়ে যেভাবে কাজ করা যায় তেমনি
মণ্ড দিয়েও খেলনা ও পুতুল তৈরি করা যায়

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সুচিশিল্প বলতে কী বোঝায়?

(ক) পোশাক পরিচ্ছদ
(খ) সুই-সুতার মাধ্যমে তৈরি নকশা বা শিল্পকর্ম
(গ) চিত্রকর্ম
(ঘ) এক ধরনের কারুশিল্প।

২. চেইন ফোঁড় দিয়ে কোনটি করা যায়?

(ক) রেখা সেলাই
(খ) রেখা ও ভরাট কাজ
(গ) শুধু মোটা রেখা সেলাই
(ঘ) মুড়ি সেলাই।

৩. বোতামঘর ফোঁড় কোনটিতে ব্যবহার করা হয়?

(ক) শুধু বোতামঘর সেলাইয়ের জন্য
(খ) বোতামঘর ও অন্যান্য ফুল লতা ইত্যাদি সেলাইয়ের জন্য
(গ) শুধু লতাপাতা সেলাই করার জন্য ।

৪. তুলা দিয়ে ছবি করতে হলে প্রথমে–

(ক) ছবির কাপড়ের ওপর পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকতে হয়
(খ) তুলা কেটে কেটে বসিয়ে দিতে হয়
(গ) তুলার ওপর ছবি এঁকে কাটতে হয়
(ঘ) কাগজের ওপর আগে ছবি এঁকে নিতে হয়।

৫. ছবি তৈরির জন্য উপযোগী তুলা কোনটি?

(ক) সাধারণ পেঁজা তুলা
(খ) শিমুল তুলা
(গ) ব্যান্ডেজের তুলা
(ঘ) কার্পাস তুলা

৬. তুলা দিয়ে রঙিন ছবি তৈরি করতে হলে কোনটি করবে?

(ক) ছবি তৈরি করার পর রং লাগানো হয়
(খ) এক এক অংশ কেটে কেটে রঙে চুবাতে হয়
(গ) আগেই তুলা রং করে শুকিয়ে রাখতে হয়
(ঘ) ছবি তৈরি করার পর তুলা রং করতে হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সূচিশিল্প কী? সূচিশিল্পের ৫টি উপকরণের নাম লেখো।

২. পাঁচটি ফোঁড়ের নাম লেখো এবং এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করো।

৩. তোমরা বিভিন্ন প্রকার ফোঁড় শিখতে আগ্রহী কেন?

ব্যবহারিক (activity)

১. একটি রুমাল তৈরি করে তাতে ডাল ফোঁড়, লেজি–ডেইজি ফোঁড় ও বোতাম ঘর ফোঁড় দিয়ে একটি নকশা সেলাই করো।

২. তুলা দিয়ে একটি পুতুল ও ফুলদানি বাড়ি থেকে তৈরি করে জমা দাও।

৩. ফেলনা জিনিস দিতে তোমার মনের মতো একটি শিল্পকর্ম করে জমা দাও।

৪. কাগজে বিভিন্ন উপাদানের ছাপ দিয়ে প্রদর্শন করো।

৫. রঙিন কাগজের টুকরা ব্যবহার করে একটি মোজাইক চিত্র তৈরি করো।

রং ও রঙের ব্যবহার

প্রাথমিক রং (জলরং)

হলুদ | লাল | নীল

মাধ্যমিক রং

কমলা | সবুজ | বেগুনি

প্যাস্টেল রং

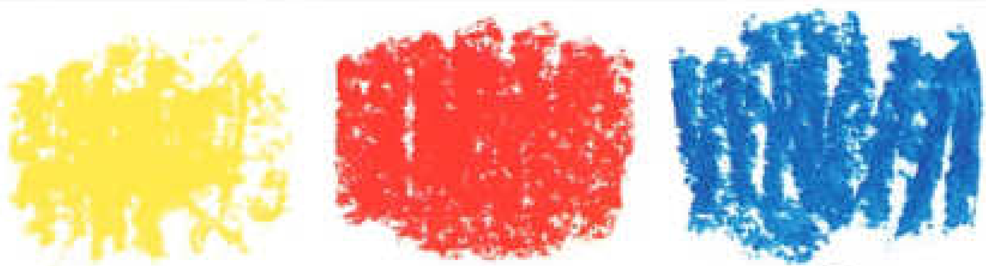

হলুদ | লাল | নীল

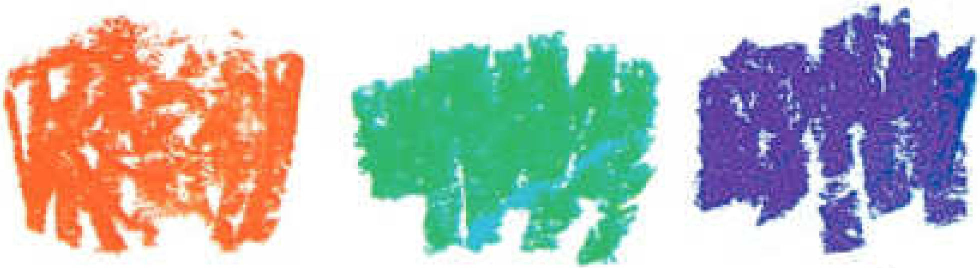

কমলা | সবুজ | বেগুনি

শিল্পী হাশেম খানের জলরঙে আঁকা নিসর্গ চিত্র

১৯৮৭ সালে জলরঙে আঁকা 'আহসান মঞ্জিল'; শিল্পী সন্জীব দাস অপু

তাসনিয়া জামান মুসলমানের প্যাস্টেল রঙে আঁকা গ্রামীণ জীবন

মো. শাহনেওয়াজের জলরঙে আঁকা গ্রামীণ জীবন

পোস্টার রঙে ছবিটি আঁকা

পোস্টার রঙে ছবিটি এঁকেছেন আহমেদ জুবায়ের অন্তু

ছাতার উপরে অ্যাক্রেলিক রং দিয়ে এঁকেছে সুপর্ণা রায় পিউ, বয়স : ১৪ বছর

ছাতার উপরে অ্যাক্রেলিক রং দিয়ে এঁকেছে পারমিতা সাহা, বয়স : ১৪ বছর

মাহির আশহাব অহনের প্যাস্টেল রঙে আঁকা ধান কাটার দৃশ্য

জারীফ আহসান নবীর প্যাস্টেল রঙে আঁকা বাউলগানের আসর

বিভিন্ন রঙের কাগজ ছিঁড়ে কোলাজ চিত্র

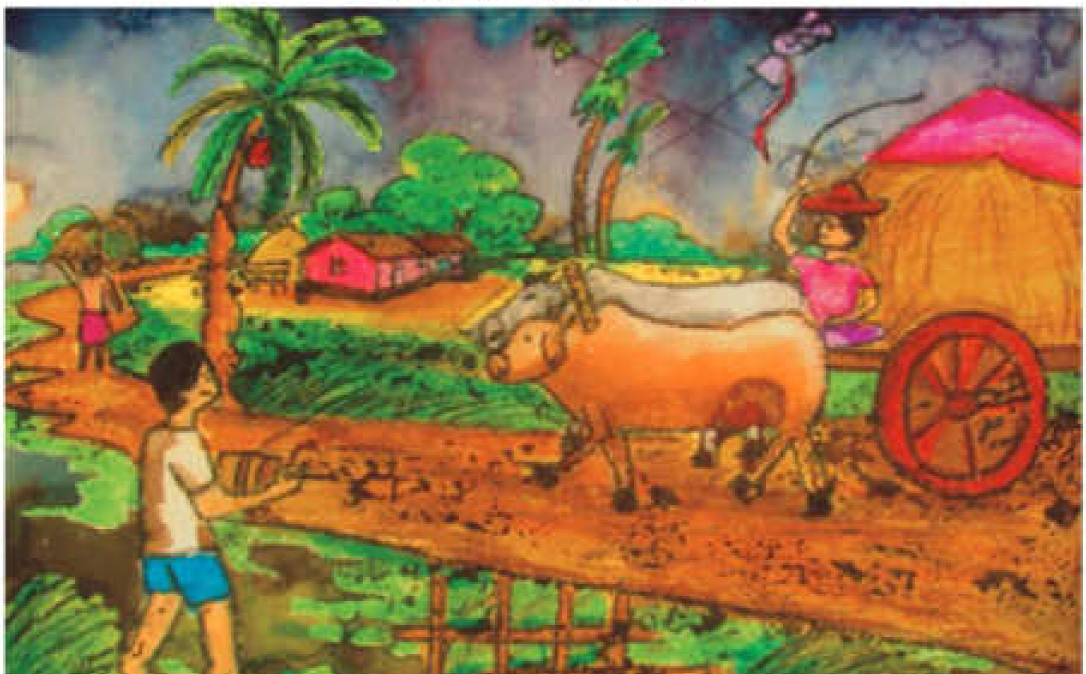

ছবিটি জলরঙে এঁকেছে রুসাফল আহমেদ মুগ্ধ

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম–চারু ও কারুকলা

পরামর্শ মানসিক শক্তি বাড়ায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।